গীতায় সাধনা

শ্রীপ্রীতি কুমার ঘোষ

গীতায় সাধনা

গীতায় সাধনা

শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ

কর্তৃক সম্পাদিত

পার্থসারথি প্রকাশন

৫-এ, অক্ষয় বোস লেন

কলিকাতা-৪

ফোন :—৫৫-৬৮৪২

: প্রাপ্তিস্থান :

নিউ শরৎ প্রকাশন

শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

বুক ও ফটো ষ্টোর

১৬, গড়িয়া হাট রোড

কলিকাতা-১৯

প্রকাশক ঃ—
শ্রীপ্রণবকুমার ঘোষ
৫।এ, অক্ষয় বোস লেন
কলিকাতা-৪

প্রথম প্রকাশ ঃ
অক্ষয় তৃতীয়া
বৈশাখ—১৩৮০

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীদেবেশ দত্ত
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৮১নং, সিমলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
মুখবন্ধ	...	...	
ভূমিকা	...	...	
পূর্বকথা	...	...	১
কর্মযোগ	...	...	৯
জ্ঞানযোগ	...	...	২৪
কর্ম-সন্ন্যাসযোগ	...	...	৩২
ভক্তিযোগ	...	...	৪৩
পুরুষ ও প্রকৃতি	...	...	৫৫
ঈশ্বরতত্ত্ব কি ?	...	...	৫৬
মোক্ষ প্রাপ্তির পথ	...	...	৫৯
ব্রহ্ম (ঈশ্বর)	...	...	৬৩
জীবের পরিক্রমণ বা জন্ম মৃত্যু	...	...	৭১
উপাসনা-পদ্ধতি	...	...	৭৭
কতিপয় অভিমত	...	...	৮৭

মুখবন্ধ

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দান উপলক্ষে ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা নামে প্রসিদ্ধ।

গীতা ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, সকল ধর্মের সার কথা। গীতার শিক্ষা জীবনে পালন বা প্রতিফলনের নামই ধর্মপালন বা আধ্যাত্ম সাধন —ঋষি-জ্ঞানীরা সকলেই এই মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করাচার্য, আনন্দ গিরি, নীলকণ্ঠ, মধুসূদন হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের লোকমান্য তিলক, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ বহু মনীষী গীতার ভাষ্য রচনা করিয়া জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন। প্রায় সকল ভাষাতেই গীতা অনূদিত হইয়াছে। গীতার শিক্ষা বিদেশীদের প্রাণেও সাড়া জাগাইয়াছে। বহু বিদেশী মনীষী ইহার ব্যাখ্যা লিখিয়া গীতার অমিয় শিক্ষার প্রতি তাঁহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পরিচয় দান করিয়াছেন।

গীতা কোন বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে। ইহা সার্বজনীন ধর্মগ্রন্থ। গীতায় যোগ চতুষ্টয়ের মাধ্যমে যে ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা অপূর্ব। কর্ম, যোগ, জ্ঞান ও ভক্তির এইরূপ সমন্বয় অন্য কোন ধর্ম-গ্রন্থে দেখা যায় না। গীতার এই অমৃতোপম শিক্ষার যতই প্রচার হয় ততই মঙ্গল; সেই কারণেই এই গ্রন্থের প্রকাশ। পাঠকবর্গের সুবিধার্থে গীতায় উল্লিখিত বিভিন্ন যোগমার্গ সম্পর্কে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শ্লোকগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে গ্রথিত করিয়া

উহাদিগকে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, ব্রহ্মযোগ ও কর্মযোগের প্রত্যেকটিই অন্য নিরপেক্ষ মোক্ষমার্গ। বর্তমান পুস্তকে গীতার শ্লোক-উদ্ধৃতি সহকারে ইহারও আলোচনা করা হইয়াছে। পুস্তকখানি যদি পাঠক সাধারণকে গীতার অনুধ্যানে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে, তাহা হইলে আমার শ্রম ও যত্ন সফল বিবেচনা করিব।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় সনৎকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ভুল-ভ্রান্তি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই সুযোগে ইঁহাদের প্রতি আমার গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। শ্রীপারিজাত কুসুম সাহা এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধন ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছেন। আমার সহিত গভীর প্রীতির সম্পর্ক তাঁহার, তাই তাঁহাকে ধন্যবাদ দানে বিরত রহিলাম। আমার প্রতি গভীর প্রীতি বশতঃ ধর্মপ্রাণ শ্রীনীরেন মৈত্র এই পুস্তক প্রকাশে সর্বতোভাবে সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ, তবে তাঁহার সহিত আমার গভীর প্রীতির সম্পর্ক চিন্তা করিয়া সাধারণ ভদ্রতাসূচক ধন্যবাদ দানে বিরত রহিলাম।

অনিবার্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সকল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহপূর্বক মার্জনা করিবেন। ইতি—অক্ষয় তৃতীয়া, বৈশাখ—১৩৮০

'শুক্লানিলয়'
৭/২১, বরদা বসাক ষ্ট্রীট,
বরানগর, কলিকাতা-৩৬

বিনীত
শ্রী প্রীতিকুমার ঘোষ

ভূমিকা

শ্রীবৈষ্ণবীয় তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা মাহাত্ম্যে একটি সুবিদিত শ্লোক এই—

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সর্ব-উপনিষদ গোধন স্বরূপ। গোপাল নন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই গোধনের দোহনকারী। অর্জুন বৎস স্বরূপ। আর অমৃতময়ী গীতা হচ্ছে দুগ্ধ—যা সুধী ভোক্তারা পান করেন। গরু থেকে দুধ আপনি নির্গলিত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় বাছুরের—যার টানে দুধ নামে বাঁটে—এবং দোহকের—যে টেনে দুধ বাহির করে। এই দুধ আবার সকলে ভোগ করে না, করতে পারে না—গোবৎস তো নয়ই। কেবল বিশেষ সামর্থ্য ও ভাগ্য আছে যাদের—তারাই শুধু দুগ্ধ পানের অধিকারী। জিজ্ঞাসু অর্জুনের প্রশ্নে উপনিষদের যে সার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দোহন করলেন সেই গীতার ভোক্তা হ'লেন সুধী···কিনা—নির্মলবুদ্ধি মানবগণ।

এই শ্লোকটির মধ্যে বোধহয় একটি সূক্ষ্ম ও কূট প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন আছে। বাছুরের টানে দুধ নামে, কিন্তু দোহানো দুধ বাছুর পান করতে পারে না। অর্জুনকে অবলম্বন করে যে গীতার সৃষ্টি সে গীতার ভোক্তা কিন্তু স্বয়ং অর্জুন ন'ন—সুধীভোক্তা অর্থাৎ সুধী, জ্ঞানী ভক্তসাধকের জন্য তার আয়োজন। তা'হলে কি অর্জুন গীতা-তত্ত্ব বোঝেন নি? তাই বা

কি করে হবে ? গীতার শেষ অধ্যায় অষ্টাদশের ৭২ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রশ্ন—শেষ বাক্যটি এই—

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥

হে অর্জুন ইহা (আমি যা বলেছি গীতাশাস্ত্র) তুমি একাগ্র হয়ে শুনেছ তো ? হে ধনঞ্জয়, তোমার অজ্ঞানজাত মোহ বিনষ্ট হল কি ?

অর্জুনের সুস্পষ্ট উত্তর—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥ ১৮।৭৩

হে অচ্যুত, তোমার কৃপায় আমার সকল মোহ নষ্ট হয়েছে, স্মৃতি লাভ করেছি আমি, স্থির-চিত্ত হয়েছি, দূর হয়েছে আমার সংশয়, আমি তোমার নির্দেশানুসারে কাজ করব।

অর্জুনের মুল ব্যাধিটির নাম মোহ। গীতা গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবানের প্রথম কথাটি (গীতার দ্বিতীয় ভগবদ্ বাক্য) হচ্ছে—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম। ২।২

কোথা থেকে তোমার এই কশ্মল অর্থাৎ মোহ কিনা—ভুলজ্ঞান—রজ্জুকে সর্প বলে ভ্রান্তি—উপস্থিত হল ? এই মোহ-ই ব্যাধি আর গীতা হল এই মোহ ব্যাধির মহৌষধ। একাগ্রমনে চেতনাতে—গীতা গ্রহণ করলে এই মোহ নাশ হয়। অর্জুন-ও অকুণ্ঠ ভাবে জানালেন যে মোহ নাশ হয়েছে তাঁর, আত্মস্মৃতি ফিরে এসেছে, চিত্ত স্থির হয়েছে। কাজেই অর্জুন নিঃসংশয়ে বললেন—"করিষ্যে বচনং তব"।

তাই করলেন অর্জুন। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করলেন, যুদ্ধে জয়ী হলেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী জীবন এমন কি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কালীন তাঁর আচরণ কি সর্বদা নষ্টমোহ ব্রাহ্মীস্থিতের সাক্ষ্য বহন করে ? আবার কেন সংশয়, সন্দেহ, নৈরাশ্য মোহ-শোকে আচ্ছন্ন হলেন ধনঞ্জয় ? কেন হলেন ? কেন গীতাজ্ঞানকে তিনি ধরে থাকতে পারলেন না ? বিষয়টি একটু গভীর ভাবে বিবেচ্য।

মনে হয় মূল বিষয়টির মধ্যেই এই অসামর্থ্যের বীজ নিহিত ছিল। সারা যৌবন-জীবন ব্যাপী অর্জুনের মনে দুর্যোধনাদির প্রতি যে ক্রোধ ছিল, আক্রোশ গচ্ছিত হয়ে ছিল—যে দুর্বার জিঘাংসা দানা বেঁধে ছিল মনের গভীরে—তা নিয়ে তিনি কুরুক্ষেত্রে এলেন। শুধু এলেন নয় —"প্রবৃত্তে শস্ত্র সম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ"। কিনা ধনুক তুলে ধরলেন তীর নিক্ষেপ করতে—তখন দুর্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিতকারী বান্ধবদের একবার ভাল করে দেখতে সাধ হল তাঁর। দেখলেন। দেখলেন—সবাই আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু। হঠাৎ কেঁপে উঠল তাঁর বুক। এঁদের হত্যা করতে হবে ?—অসম্ভব শোকার্ত হলেন, মোহাবিষ্ট হলেন গাণ্ডীবী।

ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥

অর্জুনের এই 'ন যোৎস্যে' অর্থাৎ যুদ্ধ করব না এই কথাটি—"করিষ্যে বচনং তব" এই কথায় কিভাবে পর্যবসিত হল—তাই গীতার তথা মহাভারতের কাহিনীগত প্রতিপাদ্য। অর্জুনের বুঝবার—বা অর্জুনকে বুঝাবার ধারাটি অনুসরণ করা যাক।

শ্রীভগবান অর্জুনকে প্রথমে বুঝালেন অত্মতত্ত্ব—আত্মার অমরত্ব। (১২/২—৩০/২) তারপর ক্ষাত্র-ধর্মতত্ত্ব (৩১/২—৩৭/২) তারপর

শোনালেন কর্মজ পাপ বা কর্মফল থেকে অব্যাহতির কৌশল ও বুদ্ধি-যুক্ত বা স্থিতপ্রজ্ঞ হওয়ার কথা (৩৮/২—৫৩/২) শেষে স্থিতিপ্রজ্ঞের লক্ষণও বললেন (৫৫/২—৭১/২)। অর্জুনের সংশয়-বুদ্ধিই যদি শ্রেষ্ঠ তবে কর্মের কথা কেন? ভগবান তখন দুটি প্রশস্ত পথের কথা জানালেন—জ্ঞানের পথ আর কর্মের পথ। অধিকারী ভেদে আপনার রুচি প্রকৃতি মত একটি পথে চলতে থাকে মানুষ। কিন্তু পথ দুটি পরস্পর নিরপেক্ষ নয়। প্রকৃতি অনুযায়ী যে কোন একটি পথ গ্রহণ করলেও কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই কর্মের প্রাধান্য সমধিক লক্ষিত হয়—কারণ

"শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৩।৮

কাজ না করলে শরীরই বাঁচে না, তাছাড়া দেহ মনের ক্রিয়া মনুষ্য জীবনে মুহূর্তের জন্যও কি বন্ধ করা সম্ভব?

"ন হি কশ্চিত ক্ষণমপি জাত তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।" ৩।৪

কর্মমাত্রেই নিয়ত ফলোৎপাদন করে আর সে ফল আশ্রয় করে কর্ম-কর্তাকেই। এর নাম কর্মচক্র। কিন্তু কর্ম করেও কর্মফল এড়াবার একটি কৌশল আছে। এটি কর্মযোগ। যোগী অনাসক্ত হয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কাজ করবেন। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।" (৩।২৭) প্রকৃতি কাজ করছে—আমি করছি না—এই বোধ ও বুদ্ধি কর্মফলের বারক হয়। সব মানুষের প্রকৃতি এক হয় না। কাজেই গুণত্রয়ের প্রভাব জাত স্বাভাবিক ধর্মেরও পার্থক্য নিশ্চিত। জাগতিক আচরণ ক্ষেত্রে মানুষের স্বধর্ম-ও স্বতন্ত্র। এইসব ক্ষেত্রে ভগবানের উপদেশ—

"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ। ৩।৩৫

অর্থাৎ নিজের প্রকৃতিমত অচরণ করা—তা যদি খণ্ড প্রয়াসও হয় তবু—ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কর্মপ্রচেষ্টা অপেক্ষা কল্যাণকর।

কর্মযোগী যথাকালে নিষ্কামধর্ম আচরণের পরিণামে জ্ঞান লাভ করেন—"সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। (৪।৩৩)। এ যেন কর্মের খোলা-মেঠো পথে চলতে চলতে জ্ঞানের পথে বাঁধানো পাকা পথ পেয়ে যাওয়া। সেখানে কর্মসমূহ আর কর্তার নিজস্ব থাকে না—সমত্ব বুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা (যোগসংন্যস্ত কর্মাণং—৪।৪১) সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ করেন কর্মযোগী আর আত্মজ্ঞান দ্বারা সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেন (জ্ঞান-সংছিন্ন সংশয়ম্। ৪।৪১) কর্মফল তখন এই কর্মজ্ঞান-যোগীকে বাঁধতে পারে না। কর্ম ও জ্ঞান এই দুটি পথ এক জায়গায় গিয়ে মিশে একত্ব লাভ করে—একই ফলদায়ক হয়। যৎ সাংখ্যৈ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্-যোগৈরপি গম্যতে (৫।৫)। কিন্তু এই কর্ম যে সাধারণ কাম্যকর্ম নয় এবং জ্ঞান-ও যে শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য নয়—তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এর নাম কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ। এই কর্ম-জ্ঞান যোগিগণের মধ্যেও যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হ'য়ে ভগবানকে ভজনা করেন তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী। "শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যে মাং স মে যুক্ততমো মতঃ" (৬।৪৭)। এইখানে ত্রিবেণী সঙ্গম। জ্ঞান-কর্মের গঙ্গাযমুনা এসে মিলিত হ'ল ভক্তি সরস্বতীর সঙ্গে। কর্মজ্ঞানযোগী ভক্তিযোগে সমারূঢ় হলেন। এই ভক্তির চরম কথা ও পরম পরিণাম শরণাগতি। "সর্বগুহ্যতমং" বলে অষ্টাদশ অধ্যায়ের-৬৬ সংখ্যক শ্লোকে শ্রীভগবান এই উক্তিটি করেন "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই শরণ শতদলের বীজ কিন্তু কর্মযোগাখ্য তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল শ্রীভগবানের উদাত্ত কণ্ঠে—

ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্ম চেতসা।
নিরাশী নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ॥ (৩।৩০)

অর্থাৎ সকল কর্ম আমাকে সমর্পণ করে, বিবেক বুদ্ধি দ্বারা কামনা মমতা ত্যাগ করে—শোকশূন্য হয়ে যুদ্ধ কর। তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কর্ম-যোগাখ্য তৃতীয় অধ্যায়ে যেখানে ভগবান—'লোকোঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা (৩।৩) বলে জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের কথা বলেছিলেন সেখানে-ই ভক্তিযোগের নিগূঢ় ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন তিনি। তার পর অধ্যায়ে অধ্যায়ে তার দলগুলির উন্মীলন হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ (৬।১৪) বলে নিজের দিকে অর্জুনের মনকে আকর্ষণ করেছেন তিনি। সপ্তম শ্লোকে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ভক্তি-যোগের কথাই বলেছেন, যার শেষ কথা অষ্টাদশের ৬৬ সংখ্যক শ্লোক। জিজ্ঞাসুর মোহমুক্তি—মনবুদ্ধি হৃদয়ের প্রবাহ কর্ম-জ্ঞান-ভক্তির ত্রিধারায় —কিভাবে সংঘটিত হয় তার কথা এই আলোচনার মধ্যেই সংক্ষেপে বিন্যস্ত হয়েছে।

অর্জুন শ্রীভগবানের প্রতিটি কথা যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ করেছিলেন এবং মননও করেছিলেন কিছুটা তার প্রমাণ আছে প্রতিটি শ্লোকেই অর্জুনের বিচিত্র তীক্ষ্ণ প্রশ্নাবলীর মধ্যে। বিশ্বরূপ দর্শনের আগেই যে অর্জুন মোহমুক্ত হ'য়েছিলেন তার প্রমাণ একাদশ অধ্যায়ের অর্জুনের এই উক্তিটি—

"মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্ম সং জ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম॥ (১১।১)

আমাকে অনুগ্রহ করে তুমি যে পরম গোপনীয় অধ্যাত্ম্য তত্ত্ব উপদেশ দিয়েছ, তাতে আমার মোহ নাশ হ'য়েছে।

বিগতমোহ অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করলেন। তিনি বুঝলেন—

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম গোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥ (১১।১৮)

তুমি অক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ, পরম জ্ঞাতব্য, এই বিশ্বের পরম আশ্রয় তুমি, তুমি শাশ্বত ধর্মের রক্ষক, তুমি যে সনাতন পরমাত্মা পুরুষ ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

যে তত্ত্ব শুনেছিলেন অর্জুন, চোখে তার স্বরূপ দর্শন করলেন এবার। যাকে বলে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল। ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ করবার নির্দেশ এল ভগবানের কাছ থেকে—"নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" (১১।৩৩)। দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বর্ণনা প্রসঙ্গে যোগবিত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ যোগী কে ও তাঁর লক্ষণ কি—তা বিবৃত করলেন ভগবান, যার শেষ কথা—শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ (১২।২০)। অর্থাৎ যাঁরা পূর্বোক্ত ধর্মামৃত যথাযথ পান করেন সেই শ্রদ্ধাশীল মৎপরায়ণ ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়। সন্দেহ নাই যে অর্জুন শ্রীভগবানের অতীব প্রিয় ভক্ত ছিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায়ে শরণাগতি সূচক গুহ্যতম উপদেশটি দেবার সময়-ও শ্রীভগবান বলেছেন—

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ (১৮।৬৪)

এহেন অর্জুনেরও আবার মোহ এল কেন? দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ (২।৫৩)

বৈদিক ও লৌকিক নানা কর্ম-কর্মফলের কথা শুনে শুনে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। যখন এই বুদ্ধি নিশ্চল হয়ে সমাধিতে অচলা হবে, তখন তুমি যোগযুক্ত হবে।

যোগযুক্ত হওয়া মানে স্থিতধী হওয়া। এই স্থিতধী বা স্থিত প্রজ্ঞের লক্ষণ কি তা-ও জানালেন ভগবান অর্জুনকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৫ থেকে ৭২ সংখ্যক শ্লোকের মধ্যে। তার শেষ কথাটি এই—

এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি (২।৭২)

হে পার্থ এরই নাম ব্রহ্মীস্থিতি। এই ব্রহ্মীস্থিতি লাভ করলে আর মোহ প্রাপ্তি ঘটে না। আশংকা হয় এই ব্রহ্মীস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি অর্জুন। ভগবানের সঙ্গলাভ করে, তাঁর কথা শুনে বিশ্বরূপ দেখে তাঁর অতি প্রিয় অর্জুন যে নষ্ট মোহ হ'য়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তা স্থায়ী হয় নি। কারণ ব্রহ্মীস্থিতি বা স্থিতপ্রজ্ঞতা বলতে যে অবস্থা বুঝায় তা তিনি পূরো আয়ত্ত করতে পারেন নি, অন্ততঃ তাতে স্থিতিলাভ করতে পারেন নি। বেদান্তের পরিভাষায় শ্রবণ, মনন পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও হয়ত নিদিধ্যাসন হয় নি তাঁর।

বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, প্রশ্ন করে অর্জুন জেনে নিয়েছিলেন যে স্বধর্মে স্থির থাকার পথে, কর্মযোগাদি আচরণের পথে সর্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু কাম—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেন মিহ বৈরিণম্ ॥ (৩।৩৭)

রজোগুণ থেকে জাত এই কাম, কামই ক্রোধ স্বরূপ। কাম মহাশন কিনা যার ক্ষুধা কিছুতেই মেটে না। কাম অত্যন্ত উগ্র। কামকে বৈরী মনে করবে।

কাম বৈরী বটে, কিন্তু মনুষ্য মনে নিত্য অধিষ্ঠানে তার প্রবর্তক শক্তি-রূপে। ধোঁয়া যেমন যেমন আগুনকে ঢেকে রাখে, ময়লা যেমন অস্বচ্ছ করে দর্পণকে, যেমন ঢাকা থাকে জরায়ু দিয়ে গর্ভ বা গর্ভস্থ ভ্রূণ—তেমনি কাম জ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়।

ধূমেণাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতা গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ (৩।৩৮)

নিত্য বৈরী এই কাম ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধিকে আশ্রয় করে জ্ঞানের সঙ্গে যুদ্ধ করে। উপরের উপমা তিনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, অগ্নির সঙ্গে ধোঁয়ার নিত্যাবস্থান। কিন্তু অগ্নিকে ঠিক ঠিক জ্বালালে ধূমের নির্বাণ হয়। এর জন্য বিশেষ প্রযত্ন প্রয়োজন. আবার দর্পণের আর্বজনা দূর করতে নিত্যনিয়মিত মার্জনার আবশ্যক হয়। জরায়ু বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ভ্রূণের তীব্র প্রয়াসের নামই তো জন্ম যন্ত্রণা। মোট কথা একান্ত চেষ্টা, তীব্র অধ্যবসায়, অখণ্ড সাধনা দ্বারা কামকে জয় করা যায়। জ্ঞানাগ্নি নিত্য প্রোজ্জ্বলরেখে কর্মের অবিরাম পরিমার্জনানুশীলনে ভক্তির একাগ্র তন্ময়তায় চলতে হয় সাধককে সাধনার ক্ষুরধার পথে। একি সহজ কথা ? কাম কেন্দ্র মন। মনকে স্থির করতে না পারলে যোগী হওয়া যায় না।

যথা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাব তিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ (৬।১৮)

যাঁর মন সংযত হ'য়ে আত্মাতে অবস্থান করে এবং সর্বকামনায় স্পৃহা থাকে না যাঁর—তাঁকেই যোগী বলা চলে।

সকল কামনা থেকে নিরাকাঙ্ক্ষ হওয়া কি সম্ভব ? মনকে জয় করা ইন্দ্রিয়-সমূহকে বশীভূত করা একপ্রকার অসম্ভব কাজ নয় কি ?

অর্জুনের আর্ত জিজ্ঞাসা—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম ॥ (৬।৩৪)

মন অতি চঞ্চল, ইন্দ্রিয় প্রমন্থনকারী দুর্নিবার ও দৃঢ়, বায়ুকে যেমন নিগ্রহ করা যায় না, হে কৃষ্ণ, মনকে জয় করাও তেমনি সুদুষ্কর ।

শ্রীভগবান এর উত্তরে দুটি পথের নির্দেশ দিলেন । মন যে অত্যন্ত চঞ্চল তাতে সন্দেহ নাই কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে দমন করা যায় ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ (৬।৩৫)

অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই দ্বিমুখী অভিযানে মনকে অর্থাৎ মনসিজ কামকে জয় করা সম্ভব । এইখানে গীতার সাধনা । মৃত্তিকা খননজাত সরোবর থেকে জল এসে পাত্র পূরণ করে রাখা যায়, আবার বর্ষাবারি আহরণ করেও পাত্র পূরণ করা যায় । কিন্তু পাত্রটি নিশ্ছিদ্র হওয়া চাই, অটুট হওয়া চাই । এর জন্য সাধনা—অখণ্ড সাধনার প্রয়োজন । অর্জুন করুণাধারা পেয়েছিলেন অফুরন্ত রূপে—ব্রহ্মজ্ঞান আকণ্ঠ পান করেছিলেন, কিন্তু ধরে রাখতে পারেন নি । ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ করেন নি । গীতা-জ্ঞানকে ধরে রাখতে পারেন নি অন্তরের আধারে । অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা—গীতার সাধনা দ্বারা—মনকে জয় করে নিজের আধারটি নিখাদ, অটুট, ছিদ্রহীন করতে পারেন নি । এই জন্যই বোধহয় গীতামৃতের ভোক্তা পার্থ হতে পারেন নি—হয়েছেন সুধীবৃন্দ—জ্ঞানীভক্তরা ।

গীতা একটি সাধন-শাস্ত্র । শুধু নিত্যপাঠ্য নয়, নিত্য আচরণীয় । শুধু শ্রোতব্য, মন্তব্য নয়—নিদিধ্যাসিতব্য ।

পার্থসারথি পত্রিকার সম্পাদক সুসাহিত্যিক শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ যোগীপুরুষ । সুদীর্ঘ কাল থেকে তিনি শুধু যে গীতা প্রচার বা গীতা ধর্মের আলোচনাই করছেন, বা গীতার বাণী বিষয়ে নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনা করেছেন—তা নয় । গীতানুশীলনকে একটি বিশিষ্ট সাধন পদ্ধতিতে পরিণত করেছেন, আস্বাদন করেছেন তিনি । "গীতায় সাধনা" গ্রন্থে গীতার মূল তত্ত্বগুলিকে সুললিত ভাষায় যথাসম্ভব সংক্ষেপে ও সরলভাবে এবার সাধারণ পাঠকের কাছে, গীতাজিজ্ঞাসু সাধকদের কাছেও উপস্থাপিত করেছেন তিনি । অষ্টাদশ অধ্যায়ে আলোচিত গীতার অপরিমেয় জ্ঞানরাশিকে মাত্র দশটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সংকলিত করে, সংহত করে প্রকাশ করেছেন এবং তার চেয়েও বেশী, কেবল তাত্ত্বিক আলোচনায় নিবদ্ধ না থেকে "উপাসনা পদ্ধতি" নামে অন্ত্য পরিচ্ছেদে সাধনার মর্ম কথাটি—সর্বশ্রেণী নিরপেক্ষ ভাবে—সার্বভৌম ও সর্বজনীন করে প্রকাশ করেছেন ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বোধ হয় পৃথিবীর বহুলতম আলোচিত গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের ভাষ্য যেমন অনেক, তেমনি সম্প্রদায় ভেদে, ব্যক্তিভেদে অর্থাৎ অনুভূতি ভেদে স্বাতন্ত্র্যও সীমাহীন । ফলে গীতাপাঠক বিশেষতঃ গীতাতত্ত্ব জিজ্ঞাসু নবীন পাঠকগণের পক্ষে গীতাগ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য কি তা নিয়ে বিভ্রান্ত হবার সুযোগ আছে । শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষের "গীতায় সাধনা"—গীতাতীর্থের প্রথম পরিব্রাজকগণের সেভ্রান্তি নিরসনের সহায়ক হবে । দ্বিতীয়তঃ গীতা যে কেবল কাব্যগ্রন্থ নয়, কেবল দর্শন শাস্ত্র নয় এমন কি নিত্যপাঠ্য ধর্ম-গ্রন্থ মাত্রও নয়—গীতা যে

একটি বিশেষ সাধনগ্রন্থ-অর্থাৎ জীবনে আচরণীয়-ও প্রয়োগযোগ্য গ্রন্থ, তা-ও শ্রীপ্রীতিকুমার এই গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট করে লিখেছেন। রচনাশৈলী সাবলীল ও আশ্চর্যরকম অনারষ্ট হওয়ায় বিষয়ের কাঠিন্য কোন বন্ধুরতা সৃষ্টি করে নি। আর কঠিন বিষয়কে সহজ করে বলার বিরল অধিকারটি অর্জিত হয় বিষয় সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ পারঙ্গমত্ব থেকে। এ পারঙ্গমত্ব কিন্তু শুষ্ক পাণ্ডিত্যমাত্র নয়—অনুভবগম্য সত্যচেতনার আলোকে এটি উদ্ভাসিত। "গীতায় সাধনা" গ্রন্থে এই উদ্ভাস একটি খুব স্বল্পালোচিত উপেক্ষিতপ্রায় দিকের দীপবর্তিকা। এটি পড়তে ভাল লাগবে, বার বার পড়লে একটি সাধন-সংকেত লক্ষীভূত হবে—যার ফলে সংশয়ান্ধকার নাশ তো করবেই, অধিকন্তু হয়ত আগুনের পরশমণির স্পর্শে কোন যথার্থ জিজ্ঞাসুর চেতন-শিখা প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কাজেই, এই গ্রন্থের বহুল প্রচার সব দিক থেকেই মঙ্গলকর ও প্রত্যাশিত। গীতাকে বলা হয়েছে সর্ব-শাস্ত্রময়ী ; বলা হয়েছে "গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।" অর্থাৎ কিনা অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ করে লাভ নেই যদি গীতা সুগীতা অর্থাৎ যথাযথ অনুশীলন করা যায়। এই সুগীতা শব্দটির মধ্যেই গীতার সাধনতত্ত্বের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট হয় নি কি? "গীতায় সাধনা" এই ইঙ্গিত স্ফুলিঙ্গের দীপ্যমান শিখা।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৮০
চৈত্র পুর্ণিমা তিথি।

শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী
বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ বাংলা বিভাগ এবং মহাধ্যক্ষ কলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

নমঃ নারায়ণায় নমঃ

গীতায় সাধনা

পূর্বকথা

গীতা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ছত্রিশটি ভাষায় আজ পর্যন্ত ইহার পঁচিশ শতাধিক সংস্করণ হইয়াছে। মহামান্য তিলকের মতে গীতার মত অপূর্ব গ্রন্থ কেবলমাত্র সংস্কৃত সাহিত্যেই নহে, পৃথিবীর সভ্য জাতিসমূহের সাহিত্যেও বিরল।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, উপনিষদ হইতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের কুসুমরাজি চয়ন করিয়া গীতারূপ এই সুদৃশ্য মাল্য গ্রথিত হইয়াছে। মহাত্মাজীর মতে, গীতা মানবের পারমার্থিক জননী স্বরূপা। সমগ্র মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি তাঁহার গীতা-ব্যাখ্যার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন ঃ

"ভারতে সর্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ।
গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্বশাস্ত্রময়ী গীতা॥"

অর্থাৎ, মহাভারতে সকল বেদের সারার্থ সংগৃহীত। আর সমগ্র মহাভারতের সারতত্ত্ব গীতায় বর্তমান। এই কারণে গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী —সকল শাস্ত্রের সার গীতায় নিহিত। গীতা ইহলোক ও পরলোকের সুগভীর ও শ্রেষ্ঠ রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

গীতা যে কত প্রাচীন সেই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে যথেষ্ট

মতপার্থক্য রহিয়াছে। গীতাকে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধরিলে উহার প্রাচীনত্বই প্রমাণিত হয়। কারণ রমেশচন্দ্র দত্ত এবং প্র্যাট সাহেবের মতে মহাভারত খ্রীস্টপূর্ব ১২শ শতাব্দীতে রচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস রচিত অষ্টাদশ পর্ব মহাভারতের ভীষ্মপর্বের পঞ্চবিংশতি অধ্যায় হইতে দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্তি দান উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। সেই সকল উপদেশই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা নামে প্রসিদ্ধ।

গীতা যে বুদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগের, তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, গীতায় 'ব্রহ্ম-নির্বাণের' অর্থ ব্রাহ্মীস্থিতি, বৌদ্ধ-নির্বাণের মত শূন্য নহে। গীতায় নির্বাণ শব্দটি পাঁচবার ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৭২ শ্লোকে, পঞ্চম অধ্যায়ের ২৪শ, ২৫শ, ২৬শ শ্লোকে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে)। সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতীতি জন্মে যে, 'নির্বাণ' শব্দটি বৌদ্ধগণই গীতা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব ভগবান বুদ্ধ-পূর্ববর্তী যুগে যে গীতা রচিত হয়, এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়। মহাভারত যত প্রাচীন, গীতাও তত প্রাচীন।

সমগ্র গীতাই মহাভারতের প্রকৃত অংশ। কারণ, প্রথমতঃ গীতা ও মহাভারতের অন্যান্য অংশের মধ্যে ভাষার নিকট সাদৃশ্য আছে এবং দ্বিতীয়তঃ মহাভারতের অন্যান্য পর্বে গীতার উল্লেখ আছে। কিন্তু শান্তি ও অশ্বমেধ পর্বে এবং অন্যান্য বহুস্থানে ব্যাসদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত ভগবদ্গীতার সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গীতা মহাভারতের প্রকৃত অংশ, মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নহে।

গীতার ভাষা প্রাঞ্জল, সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। শুচি-অশুচি সর্বসময়েই গীতাপাঠ অবিধেয় নহে—বিশেষ করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন অর্থাৎ একাদশ অধ্যায়।

গীতার শঙ্কর ভাষ্যই প্রাচীনতম প্রাপ্তব্য ভাষ্য। গীতা-ব্যাখ্যাতাদিগের মধ্যে চারিজন বাঙ্গালী প্রধান—মধুসূদন সরস্বতী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং বর্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দ।

গীতার শ্লোকসংখ্যা লইয়াও বিভিন্ন মতভেদ রহিয়াছে। এ যাবৎ সাধারণের ধারণা গীতার শ্লোকসংখ্যা সাত শত।

শঙ্করাচার্য হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাপর ভাষ্যকার, টীকাকার, ব্যাখ্যাকারগণ এই সংখ্যাকেই নির্বিবাদে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিকতম গবেষণা হইতে এই তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এই শ্লোকসংখ্যা সম্পূর্ণ নহে, শ্লোকসংখ্যা হইবে সাতশত পঁয়তাল্লিশ। ব্যাসদেবের বাক্যই এই মতের প্রথম ও প্রধান সমর্থক। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের ৪৩ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে আছে ঃ

ষট্ শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং চ সঞ্জয়ঃ॥
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াঃ মানমুচ্যতে॥

অর্থাৎ বর্ণিত শ্লোকসংখ্যার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত শ্লোকের সংখ্যা হইল ছয়শত কুড়ি, অর্জুন-কথিত শ্লোকসংখ্যা হইল সাতান্ন, সঞ্জয়-উক্ত শ্লোকসংখ্যা সাতষট্টি এবং ধৃতরাষ্ট্র-উক্ত শ্লোকের সংখ্যা মাত্র একটি। কিন্তু সাধারণ প্রচলিত গীতায় সাতশত শ্লোকের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত শ্লোকের সংখ্যা ৫৭৫টি, অর্জুন-উক্ত শ্লোক-সংখ্যা ৮৪টি, সঞ্জয়-উক্ত শ্লোকের সংখ্যা ৪০টি এবং একটি মাত্র ধৃতরাষ্ট্র উক্ত।

শ্রীচৈতন্যদেব-শিষ্য গদাধর রচিত গীতায়ও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের হস্তলিপিসহ এই পুঁথি মুর্শিদাবাদে গদাধরের শ্রীপাটে এখনও সুরক্ষিত। ইহা ব্যতীত কাথিয়াবাড়ের গণ্ডাল স্টেটের রাজবৈদ্য জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ভূর্জপত্রে লিখিত একখানি পুঁথি কাশী হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহাতেও ৭৪৫টি শ্লোক আছে।

আপন আপন ধর্মমত অনুযায়ীই ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকার বা টীকাকার গীতার ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বৃত্তিকার বোধায়নের মতে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ই গীতার মুখ্য প্রতিপাদ্য, পৃথক কিছুই মোক্ষদান করে না। কিন্তু শঙ্করাচার্য এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন :

তস্মাৎ গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানাৎ মোক্ষপ্রাপ্তিঃ, ন কর্ম-সমুচ্চয়াৎ',—অর্থাৎ মাত্র তত্ত্বজ্ঞানের মাধ্যমেই মোক্ষলাভ সম্ভব, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ের ফলে নহে। নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি বা যোগ দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলেই মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে। আত্মজ্ঞান লাভ না হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অসম্ভব।

রামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগতভেদ যে থাকিবে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য। মাধ্বাচার্য মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া পরব্রহ্মের সহিত জীব-কুলের নিত্যভেদ প্রতিষ্ঠা করেন। বালগঙ্গাধর তিলকের মতে 'নিষ্কাম কর্মই গীতার ধর্ম'—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ আত্মজ্ঞান সত্ত্বেও নিষ্কাম কর্ম ও অনুষ্ঠান প্রচার করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীর মতে জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিই মুখ্য প্রতিপাদ্য, কিন্তু তিনি জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির প্রাধান্যই স্বীকার করিয়াছেন। মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, শঙ্করানন্দ প্রভৃতি মনীষিগণ শঙ্করের মতেরই অনুরাগী। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের

মতে 'গীতা' বার বার উচ্চারণ করিলেই যাহা হয়, তাহাই গীতার শিক্ষা। গীতার মূলকথা হইল—"ত্যাগেনৈকেন অমৃত-তত্ত্বমানশুঃ"—অর্থাৎ ত্যাগই গীতার বাণী।

মহাত্মা গান্ধীর মতে "গীতা সূত্র গ্রন্থ নহে। ইহা এক মহান ধর্মকাব্য। ইহাতে যতই ডুবিয়া যাওয়া যাইবে, ততই নূতন ও সুন্দর অর্থ পাওয়া যাইবে। গীতা জনসমাজের জন্য—উহাতে একই বস্তু বহু-প্রকারে বলা হইয়াছে। এই জন্য গীতার মহাশব্দের অর্থ যুগে যুগে বদলাইতেছে ও বিস্তার পাইতেছে। গীতার মূলমন্ত্র কখনও বদলায় না। এই মন্ত্র যে রীতিতেই সিদ্ধ করা হউক, সেই রীতিতেই জিজ্ঞাসু ইচ্ছামত অর্থ করিতে পারেন।"

যে রূপক অবলম্বনে গীতার সৃষ্টি তাহার সুন্দর বর্ণনা কঠোপনিষদে আছে :—

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুঃ বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিনঃ॥
যস্ত্ববিজ্ঞানবান্ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণ্যবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা।
তস্যেন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
ন স তৎ পদমাপ্নোতি সংসারং চাধিগচ্ছতি॥

যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদাশুচিঃ।
স তু তৎ পদমাপ্নোতি যস্মাদ্ ভূয়ো ন জায়তে॥
বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ প্রগহবান্ নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম বলিয়া জান। জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইন্দ্রিয় নিচয়কে অশ্ব, তৎসমূহে গৃহীত রূপ-রসাদি বিষয়সমূহকে পথ এবং ইন্দ্রিয় মনোযুক্ত আত্মাকে ভোক্তা অর্থাৎ রথী বলিয়া থাকেন। যে সর্বদা অসমাহিতমনা ও অবিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় অ-বশ হয়। যে সর্বদা সমাহিতমনা ও বিবেকী হয়, তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ সারথির উত্তম অশ্বের ন্যায় বশবর্তী হয়। যে অবিবেকী, অসমাহিত-মনা, সর্বদা অশুচি, সে অক্ষয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সংসারগতিই প্রাপ্ত হয়। যে বিবেকী সমাহিত-মনা ও সর্বদা শুচি, কেবল সেই সে পদ পায়, যাহা পাইলে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। বিজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ সেই মনুষ্য সংসার-পথের মুক্তি-পাথেয় স্বরূপ বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে।

গীতা-মাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে—"ধর্মময়ী গীতা সর্বজ্ঞান প্রযোজিকা"—অর্থাৎ ধর্মময়ী গীতা সকল জ্ঞান প্রদায়িনী। গীতা বহু শাস্ত্রের সার। যেখানে গীতা গ্রন্থ থাকে এবং যেখানে গীতা পাঠ হয়, সেই স্থানে প্রয়াগাদি সকল তীর্থ বিরাজ করে। সেখানে সকল দেবতা ঋষি, যোগী ও পন্নগ ও নারদ, উদ্ধব ও পার্ষদগণ সহ গোপাল ও গোপিকাগণ সমাগত হন এবং যিনি ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গীতা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন, তিনি সমস্ত বেদশাস্ত্র এবং পুরাণ অধ্যয়ন করিয়া

থাকেন। অর্থাৎ এক গীতা অধ্যয়ন করিলেই সমগ্র বেদ ও পুরাণে বিশেষ উপপত্তি জন্মে। ইহার প্রমাণ স্বামী কৃষ্ণানন্দ সম্পাদিত গীতা-মাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে :—

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র তত্র পাঠঃ প্রবর্ততে।
তত্র সর্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ॥
সর্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ॥
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্র পুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ॥

(বৈষ্ণবীয়, তন্ত্রসার)

গীতা সমগ্র উপনিষদেরই সারসংগ্রহ—উপনিষদ-তত্ত্বই গীতায় পত্রপুষ্পে শোভিত এবং পরিবর্তিত। গীতা ধ্যানেই বর্ণিত হইয়াছে যে, উপনিষদ্‌রূপ গাভীসমূহের দুগ্ধই এই গীতামৃত এবং তাহার দোগ্ধা হইলেন বসুদেবসূতরূপী পরমপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

অর্থাৎ উপনিষদাবলী হইল গাভীসমূহ, সেই সকল গাভীর দোগ্ধা হইলেন শ্রীকৃষ্ণ (গোপালকের পুত্র), অর্জুন হইলেন বৎস এবং মহাদুগ্ধ হইল অমৃতময়ী গীতা। জ্ঞানী অর্থাৎ বিবেকীগণই সেই দুগ্ধের পানকর্তা।

এই কারণেই শঙ্করাচার্য তাঁহার উপনিষদ্ এবং গীতার ভাষ্যে একই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন :

ইদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত বেদার্থ সার-সংগ্রহভূতং।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর ন্যায় গীতারও অখণ্ড পাঠ হইয়া থাকে। কোথাও কোথাও গীতার নিত্যপাঠ হয়। সুর-তাল-লয় যোগে বহুস্থানে গীতা গীত হয়।

গীতা এবং ভাগবতে রূপভেদে একই তত্ত্ব পরিবেশিত হইয়াছে। গীতার বক্তা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের বাণী ও লীলা মাহাত্ম্য গ্রথিত। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় এবং ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে জ্ঞানযোগ বর্ণিত হইয়াছে। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং ভাগবতের দশম স্কন্ধে ভক্তিযোগ বিবৃত। উভয়শাস্ত্রেই সমানভাবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি ও যোগতত্ত্ব স্থান পাইয়াছে।

কর্মযোগ

বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা সত্যের যে সন্ধান তাহাকে বলা হয় দর্শন ; এবং অন্তর্জীবন বা বহির্জীবন দিয়া সত্যের যে উপলব্ধি তাহাকেই বলা হয় ধর্ম অর্থাৎ ধৃ + মন্।

যাহা কিছু করা যায় তাহাই কর্ম নহে ; কৃ + মন্ অর্থাৎ মন যাহা করায় তাহাই কর্ম এবং প্রকৃত কর্মের সহিত মনের যে যোগ তাহাই অর্থাৎ সেই যোগফলই কর্মযোগ।

যোগঃ কর্মসু কৌশলম্॥ ২।৫০

অর্থাৎ কর্মের কৌশলই যোগ। কর্মের স্বভাব বন্ধন। কর্মে সমত্ব বুদ্ধিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে কর্মের স্বাভাবিক বন্ধনশক্তি নষ্ট হয়, ফলাসক্তি চলিয়া যায়।

গীতা প্রচারকালে ভারতবর্ষে যজ্ঞ-দানাদি কর্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল। ঐ সকল সংশয় লক্ষ্য করিয়া গীতায় বলা হইয়াছে—

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ ১৮।৩

অর্থাৎ সাংখ্যবাদিগণ বলেন—কর্মমাত্রই বন্ধনের কারণ। অতএব সকলেরই সর্ব কর্ম ত্যাগ করা বিধেয়। কিন্তু মীমাংসকগণ বলেন—যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ বিহিত কর্ম কাহারও পক্ষে ত্যাগ করা উচিত নয়। কারণ, বিহিত কর্মত্যাগে প্রত্যবায় হয়।

ঐ সকল সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত গীতায় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে—

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ১৮।৫

অর্থাৎ যজ্ঞ-দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই সকল কর্ম করাই বিধেয়। কারণ, ইহারা ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগী মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধিকারক।

গীতা আরও নির্দেশ দিয়াছেন—

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ॥ ১৮।৭

অর্থাৎ অবশ্যকর্ত্তব্য নিত্য কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে। কারণ নিত্যকর্ম চিত্তশুদ্ধিকর। অজ্ঞানবশতঃ নিত্যকর্ম ত্যাগ করাকে তামস ত্যাগ বলে।

দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করাকে গীতা বলিতেছেন—

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ ১৮।৮

অর্থাৎ কর্মকে দুঃখকর মনে করিয়া যিনি দৈহিক ক্লেশের ভয়ে কর্ম ত্যাগ করেন, তিনি এই রাজসিক ত্যাগ করিয়া জ্ঞানসংযুক্ত সর্বকর্ম ত্যাগের মোক্ষফল লাভ করিতে পারেন না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, গীতা যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম ত্যাগের অনুমোদন করেন না, উহাদের অনুষ্ঠানেরই সমর্থন করেন।

এমনকি যাঁহারা আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, যাঁহাদের পক্ষে কর্ম পরিত্যাগ সম্ভব, গীতার মতে তাঁহাদেরও কর্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য।

গীতায় নির্দেশিত এই উপপত্তি সকলের থাকা একান্ত প্রয়োজন যে, আত্মা কোন কর্মের প্রবর্তক বা আশ্রয় নহেন। যথা—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ॥ ১৮।১৮

অর্থাৎ, জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা সকল ক্রিয়ার ত্রিবিধ প্রবর্তক। কারণ, এই তিনটি একত্র হইলেই সকল ক্রিয়া আরম্ভ হয়। এবং করণ (ইন্দ্রিয়), কর্ম (ক্রিয়া) ও কর্তা (করণের প্রযোক্তা)—এই তিনটিতে সর্বক্রিয়া সংগৃহীত, সমবেত। অতএব আত্মা কোন কর্মের প্রবর্তক বা আশ্রয় নহেন।

যাঁহারা বিচার করিয়া নৈষ্কর্ম্যের লাভের জন্য কর্মমাত্র ত্যাগে প্রয়াসী হন, তাঁহারা ভ্রান্ত। কেন না কর্ম না করিলে নৈষ্কর্ম্য অনুভব করা সম্ভব নহে এবং সন্ন্যাস দ্বারাই অর্থাৎ কর্মের বাহ্য ত্যাগ দ্বারা সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। নৈষ্কর্ম্য অর্থে নৈষ্কর্ম্য ভাব, নিষ্ক্রিয় আত্মস্বরূপে অবস্থিতি, মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম না করা। এবম্বিধ নিষ্কর্মতার অনুভব, কর্ম না করিয়া কেহ পাইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কর্ম-ব্যতিরেকে ক্ষণমাত্রও কেহ থাকিতে পারে না; প্রকৃতির গুণ ব্যক্তি-মাত্রকেই কর্ম করায়। ইহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বাহ্যতঃ কর্মত্যাগের প্রয়াস করে—একদিকে কর্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অপর দিকে মনে মনে বিষয় ভোগ করে, সে ব্যক্তি মিথ্যাচারী। যে বাহ্যতঃ শরীরকে রোধ করিবার প্রয়াসী হয় অথচ মন দ্বারা অথবা সুযোগ লাভ ঘটিলেই দেহদ্বারাও বিষয় উপভোগ করে; সে মিথ্যাচারী। কিন্তু যে ইহার

বিপরীত করে, অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম করে আর অপরদিকে মন সংযত করিয়া তাহাকে বিষয়ভোগ হইতে বিরত রাখে, সেই শ্রেষ্ঠ গন্তব্য পথ চিনিতে পারে।

গীতা বলেন—

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্য, পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৩।৪

অর্থাৎ, কর্মানুষ্ঠান না করিয়া কেহ নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে পারে না। কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি ও আত্মবিবেক না হইলে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানযুক্ত বা বিদ্বৎ সন্ন্যাসের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় না। কেবলমাত্র জ্ঞানশূন্য কর্মত্যাগ দ্বারা উক্ত অবস্থা লাভ অসম্ভব।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

অর্থাৎ কোন লোকই কর্ম না করিয়া এক মুহূর্তও থাকিতে পারে না। ভালবাসা বা বিদ্বেষ স্বভাবজাত ধর্ম। ইহারাই জোরপূর্বক মানুষকে সকল কর্ম করাইয়া থাকে।

গীতার সরল ভাষ্য—

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥ ৩।১৭

অর্থাৎ যে লোক কেবলমাত্র আত্মাতেই তৃপ্ত, প্রীত এবং সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কোন কিছু করিবার প্রয়োজন নাই ;—অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে সকল কর্ম পরিত্যাগ সম্ভব।

কারণ—

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ ৩।১৮

সর্বভূতের মধ্যে তাঁহার কোন প্রার্থনীয় থাকে না বলিয়া কর্ম করিলেও তাঁহার কোন প্রাপ্তি ঘটে না এবং কর্ম না করিলেও কোন পাপ হয় না বা প্রত্যবায় হয় না।

কিন্তু কোন কোন উপনিষদে ও গীতাতে তাঁহাদিগকেই সর্বাপেক্ষা উর্দ্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছে, যাঁহারা মুক্ত হইয়াও লোকহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, তাঁহারা কর্মরত অথবা কর্মবিরত থাকিলে তাহা হইতে কি কি সম্ভাব্যতা আসিতে পারে। যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তো সকল উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাফল্য লাভের চূড়ায় গিয়া পৌঁছিয়াছেন, যাহা কিছু তাঁহার হইবার সকলই শেষ হইয়াছে। তিনি ধন্য হইয়া নিজকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। কিন্তু ইহার পর তাঁহার আর কি করিবার থাকিল? এক ইহাই হইতে পারে যে, তিনি আর কোন কিছুই না করিয়া সর্বক্ষণ ভগবানের ধ্যানেই নিমগ্ন থাকিলেন। ইহাকে শাস্ত্রে বলা হয় জড়বৎ ভাব অর্থাৎ জড়ভরতের মত হইয়া থাকা। অথবা ইহাও হইতে পারে যে, দিব্য চেতনা পাইয়া তিনি শিশুর মত হইয়া রহিলেন—যাহাকে বলা হয় বালবৎ ভাব। আবার ইহাও হইতে পারে যে, দিব্যানুভবের অত্যুল্লাসে তিনি নাচিয়া গাহিয়া একটি রসাবিষ্ট অবস্থাতে ভগবৎ-মিলনের সুখ লইয়া আত্মহারা হইয়া রহিলেন অর্থাৎ যাহাকে বলা হয় উন্মত্তবৎ ভাব। ইহা ব্যতীত আরও এক প্রকার ভাব আছে, তাহাকেই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠস্থান দেওয়া হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে গীতা বলিয়াছেন—

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্তুমর্হসি॥ ৩।২০

অর্থাৎ জনকরাজা, যিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াও নিজকে নিরাসক্ত রাখিয়া নিখুঁতভাবে তাঁহার রাজকার্য চালাইয়া গিয়াছেন। সুতরাং লোকসংগ্রহের (মানুষকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করা এবং সৎপথে বা স্বধর্মে প্রবৃত্ত করাই লোকসংগ্রহ) নিমিত্তও নিষ্কাম কর্ম করা উচিত। যোগিশ্রেষ্ঠ এবং সিদ্ধশ্রেষ্ঠ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই ভাবেই জনকরাজার মত লোকহিতার্থে আপন কর্তব্য কর্ম করিবার প্রেরণা দিয়াছিলেন।

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তাশ্চিকীর্ষুর্লোক সংগ্রহম্॥ ৩।২৫

হে ভারত, অজ্ঞানিগণ আসক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম করেন, জ্ঞানিগণ অনাসক্ত হইয়া লোকশিক্ষার জন্য সেইরূপ কর্ম করিবেন।

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥ ৩।২১

কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন সেই সম্প্রদায়ের সাধারণ লোকে তাহাই অনুকরণ করে। তিনি যে লৌকিক বা বৈদিক কর্ম প্রামাণিক বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, অপরে তাহারই অনুবর্তন করিয়া থাকে।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ* সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ৩। ২৬

জ্ঞানিগণ কর্মাসক্ত জ্ঞানহীনগণের বুদ্ধিভেদ (বুদ্ধির চালন বা ভ্রম। এই শুভকর্ম আমার কর্তব্য, এই কর্মের এই প্রকার শুভ ফল হইবে—লোকের এই নিশ্চয় বা বুদ্ধি বিচলিত করিবে না) জন্মাইবেন না। পরন্তু যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্বক জ্ঞানহীনদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করিবেন।

*যোজয়েৎ ইতি বা পাঠঃ। শঙ্করাচার্য, নীলকণ্ঠসূরি, মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীধরস্বামী যোজয়েৎ পাঠ লইয়াছেন।

সুতরাং গীতা বলিতেছেন—

নিয়তং কুরুকর্ম ত্বং কর্মজ্যায়ো হ্যকর্মণঃ।
শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ॥ ৩।৮

তুমি শাস্ত্রবিহিত (অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহার বিধান আছে) নিত্যকর্ম্ম কর। কর্ম না করা অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়ঃ। কর্মহীন হইলে তোমার দেহযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না।

অতএব—

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ।
যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ১৮।৫

যজ্ঞদান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নয়। এই সকল কর্ম করাই উচিত। কারণ, ইহারা ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগী মনীষিগণের চিত্ত-শুদ্ধিকারক।

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৫।১১

নিষ্কাম কর্মযোগিগণ ফলাসক্তি বর্জনপূর্বক মমত্ব-ভাবশূন্য (আমার —এই ভাবরহিত) হইয়া কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন।

এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্॥ ১৮।৬

অতএব হে অর্জ্জুন! আসক্তি ও ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া এই সকল কর্ম করাই কর্তব্য—ইহাই আমার নিশ্চিত শ্রেষ্ঠ মত।

নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী। বর্ণধর্ম ও আশ্রমধর্ম অনাসক্তভাবে পালন করিলে ভগবদ্দর্শন হয়। গীতায় বলা হইয়াছে—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ৩।১৯

অর্থাৎ ফলের আশা ছাড়িয়া সর্ব সময়েই কর্তব্যকর্ম করিয়া চল। কারণ, ফলের আশা ছাড়িয়া কাজ করিলে মানুষের চিত্তশুদ্ধি জন্মে এবং মানুষ জ্ঞানলাভ ও মুক্তিলাভ করে।

অনাসক্ত মানুষই জগতে পূর্ণ স্বাধীনতা ও শান্তি উপভোগ করিতে সমর্থ। তিনি জগতে বাস করিয়াও জগদতীত হন। গীতোক্ত অনাসক্ত মানুষই আদর্শ পুরুষ। যিনি যত অনাসক্ত তিনি তত উন্নত। গীতায় ভগবান যজ্ঞকর্ম করার নির্দেশ দিয়াছেন। পরোপকারার্থে, ঈশ্বরার্থে, ত্যাগার্থে কৃত যে কর্ম তাহাই যজ্ঞ কর্ম। যজ্ঞার্থে ব্যতীত অন্য সমস্ত কর্মানুষ্ঠানই বন্ধনমূলক।

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

ক্ষণকালমাত্রও কর্ম না করিয়া অথবা না করা অবস্থাযুক্ত হইয়া কেহ থাকিতে পারে না। কারণ সকলেই শক্তিহীনের মত প্রকৃতিজাত গুণসকল দ্বারা কর্ম করে। মানুষের যাবতীয় কাজ এই ত্রিগুণের বশেই হয়। কেননা মানুষ তাহার দেহস্থ শক্তি বা তেজের দ্বারাই তাহার কাজ করিতে পারে এবং এই তেজের রূপ মানুষের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অতএব এই তেজের ক্রিয়ার ফলেই শরীর অবিরতভাবে কাজ করিয়া যাইবে; যদিও সেই কাজের কতকগুলির দ্বারা মানুষ স্ব-ইচ্ছার নিয়ন্ত্রনাধীন করিতে পারে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জুন।
কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥ ৩।৭

হে অর্জুন! কিন্তু যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া, অতি ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্মেন্দ্রিয়সমূহের সাহায্যে করণীয় কর্ম করিতে আরম্ভ করেন তিনিই বিশিষ্টতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। অর্থাৎ পূর্বোক্ত শ্লোকে বর্ণিত প্রকৃতির বিশেষ শক্তির দ্বারা সৃষ্ট-মানুষ-হইয়াছে। সেই শক্তির কতকগুলি নিয়ম আছে, যে নিয়মে সেই শক্তিগুলির প্রয়োগ-কৌশলই হইল প্রকৃতির নির্দেশ। সেই নির্দেশ মনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনকে সবসময় সঠিকভাবে সক্রিয় করিতে পারে না। সে কারণ, প্রকৃতির সৃষ্ট বিভিন্ন বাস্তব সৃষ্টির অবস্থা সঠিকভাবে উপলব্ধি করিয়া ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তৃক আহরিত ঘাতকে মনের দ্বারা বাস্তবতার ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া, কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রকৃতির নির্দেশিত পথে কাজ করিয়া, মানুষের প্রয়োজনীয় জ্ঞানসমূহ লাভ করিতে সচেষ্ট হইলেই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হইবে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর॥ ৩।৯

হে কুন্তীনন্দন! এই লোক অর্থাৎ মানুষ যজ্ঞ ছাড়া অর্থাৎ অন্যরূপ কর্ম করিলে অন্যরূপ কর্ম হইতে কর্মবন্ধন প্রাপ্ত হয়। অতি ইচ্ছাহীন হইয়া যজ্ঞের জন্যেই কর্ম কর বা সে কারণে অতি ইচ্ছাহীন হইয়া কাজ কর। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে যজ্ঞের জন্যে কর্ম করিবে। যজ্ঞ বলিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভের জন্যে কর্মপ্রক্রিয়া অর্থাৎ যোগ—অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি, তাহার জন্য যে প্রক্রিয়া তাহাই যজ্ঞ। অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ হইল আসল যজ্ঞের সাধারণ প্রতীক। আসলে স্রষ্টার নির্দেশ হইল যজ্ঞ অর্থাৎ উৎপাদন ক্রিয়া করিয়া তাহাকে বৃদ্ধিলাভ এবং অভীষ্ট লাভ করিতে হইবে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥ ৩।১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্য থ॥ ৩।১১
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ॥ ৩।১২

পুরাকালে স্রষ্টা যজ্ঞশক্তি সমন্বিত মানুষ সৃষ্টি করিয়া বলিয়াছিলেন, "ইহা দ্বারা সমৃদ্ধ হও, ইহা তোমাদের অভীষ্ট ফল প্রদান করুক। ইহা-দ্বারা দেবতাদের অর্থাৎ শ্রেষ্ঠদের তৃপ্ত কর, সেই দেবগণই তোমাদের তৃপ্তিদান করিবেন। পরস্পরকে তৃপ্ত করিয়া পরম কল্যাণ লাভ কর। কারণ জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠগণ যজ্ঞদ্বারা সম্বর্ধিত হইয়া তোমাদিগকে

প্রয়োজনীয় বা অভীষ্ট ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। তাঁহাদের দেওয়া জিনিস তাঁহাদের না দিয়া যাহারা সেই ভোগ্যদ্রব্য ভোগ করে, তাহারা চোরের মতই।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥ ৩।১৪
কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব-গতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম॥ ৩।১৫
এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি॥ ৩।১৬

অন্ন অর্থাৎ আহার্য হইতেই জীবসমূহ উৎপন্ন হয়, মেঘ অর্থাৎ বৃষ্টি হইতে অন্ন (আহার্য বস্তু) উৎপাদন হয়, যজ্ঞ হইতে মেঘ বা বৃষ্টি হয়। যজ্ঞ কর্মজাত। কর্ম ব্রহ্মজাত আবার ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উদ্ভূত। সে কারণ সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত ব্রহ্ম সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ অবস্থিত বা নিযুক্ত।

শাঙ্করভাষ্যে 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বেদ' করা হইয়াছে। এবং তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কর্ম বেদ হইতে জাত এবং বেদ পরমেশ্বর হইতে উদ্ভূত (মুখ-নিঃসৃত বাণী হিসাবে)। সুতরাং সর্বস্থানে অবস্থিত যে বেদ (বেদ সকল বিষয়ের অর্থের প্রকাশক বলিয়া) তাহা সর্বদাই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (কেননা বেদে কর্মবিধির প্রাধান্য রহিয়াছে)।

কিন্তু শঙ্করের ব্রহ্মশব্দের এই 'বেদ' অর্থ করিবার কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। কেননা গীতায় আর কোন স্থানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদ করা হয় নাই।

এই প্রচলিত চক্র অর্থাৎ চক্রাকার নিয়ম এই জগতে যে অনুসরণ করে না, সে-ই (পাপজীবন) ইন্দ্রিয়পরায়ণ নিষ্ফল জীবন যাপন করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কর্মতত্ত্বে বলা হইয়াছে, বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম বুদ্ধিহীন কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব বুদ্ধিলাভে সচেষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু এই স্থানে যে কর্ম-করার উপর এত জোর দেওয়া হইতেছে, সেই কর্ম করিতে মনের দরকার এবং জ্ঞানলাভ করিবার জন্যও মন দরকার। কিন্তু মন একই সঙ্গে দুইদিকে যাইতে পারে না।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ৩।১৩

যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোগকারী সৎব্যক্তিরা সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু যে পাপীরা নিজে সবটুকু ভোগের জন্য পাক করে; অর্থাৎ উৎপাদন করে, তাহারা পাপই ভক্ষণ করে অর্থাৎ ভক্ষণের ফলে পাপ কাজই করে।

যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্। ৪।৩০

যজ্ঞের অবশিষ্টাংশমাত্র ভোজনকারী যজ্ঞের তত্ত্বজ্ঞান বিশিষ্ট, ইহারা চিরন্তন ব্রহ্মকে লাভ করে।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ৩।১৭

অর্থাৎ যে মানুষ আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত শক্তিতেই যিনি বিশ্বাসী, তাঁহার করণীয় কিছুই থাকে না।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ৩।১৮

এই জগতে তাহার কর্মেরও কোনো প্রয়োজন নাই, না করারও কিছু নাই। এবং তাহার কোনো সৃষ্টিতেই কিছু প্রয়োজনাপেক্ষাও নাই। ব্যপাশ্রয় বা ব্যপাশ্রয়ণ অর্থে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোন কার্যের দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ৩।২৭

প্রকৃতির গুণসমূহদ্বারা সকল কর্ম কৃত হয়। অহঙ্কার দ্বারা মোহগ্রস্ত ব্যক্তি 'আমি কর্তা' ইহা মনে করে। প্রকৃতি শব্দ একটি পারিভাষিক শব্দ ইহার সংজ্ঞা গীতায় ১৩/২০ শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। এস্থানে ইহাকে আমরা এক কথায় প্রকৃতিদত্ত দেহের মধ্যস্থ সগুণতেজ বলিয়া অভিহিত করিতে পারি।

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ৩।২৯

প্রকৃতির গুণদ্বারা অবশীকৃত হইয়া মানুষেরা গুণবিহিত কর্ম করিতে সচেষ্ট হয়। সর্বজ্ঞানী ব্যক্তি সেই অল্পজ্ঞানী বিমূঢ় ব্যক্তিদের বিচলিত করিবেন না।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৩।৪০

ইন্দ্রিয়গুলি, মন ও বুদ্ধি ইহার আশ্রয়স্থল বলিয়া কথিত। ইহা (কামনা) ইহাদের (ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি দ্বারা) জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া দেহধারী জীবদের (মানুষকে) বিভ্রান্ত করে।

কামনা কিভাবে সৃষ্ট হয় তাহা গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬২ শ্লোকে বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা বলা যায়, ইন্দ্রিয়গুলি প্রথমে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কামনার বিষয়টির ঘাত গ্রহণ করে, অতঃপর মন সে বিষয়ে সচেতন হইয়া উঠে এবং তৎপরে বুদ্ধির দ্বারা তাহা পাইবার চেষ্টা করে। সুতরাং কামনা যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আশ্রয়স্থল ইহা বলা যায়। সাধারণতঃ ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, কামনা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়াই মানুষকে বাস্তব হইতে বিচ্যুত করে, কেননা, বাস্তব জ্ঞান থাকিলে এরূপ ভাবে বাস্তবের সঠিক জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নহে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্॥ ৩।৪১

হে ভরতবংশীয় শ্রেষ্ঠ অর্জুন, সে কারণে তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাশক এই পাপকে পরিত্যাগ কর বা পরিহার কর।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্য পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ॥ ৩।৪২

ইন্দ্রিয়গুলি দেহাংশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। ইন্দ্রিয়গুলি হইতে মন শ্রেষ্ঠতর, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বুদ্ধি হইতেও যে শ্রেষ্ঠ, সে হইল তিনি অর্থাৎ সৃষ্টির আদি বা মূল যিনি।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥ ৩।৪৩

হে মহাবলী অর্জুন! এইরূপ বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিনি অর্থাৎ সৃষ্টির আদিকে বুঝিয়া—উপলব্ধি করিয়া অর্থাৎ সে সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানলাভ করিয়া নিজের মন দ্বারা নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া কামনারূপ দুর্জয় শত্রুকে জয় কর।

জ্ঞানযোগ

জ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হইয়াছে—

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম॥ ১৩।৩২

হে অর্জুন! সকল ক্ষেত্রের মধ্যে আমিই ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের প্রকৃত জ্ঞানই পরম জ্ঞান বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদের জ্ঞানই পরম জ্ঞান।

সেই জ্ঞানের মূল উৎস লাভের উপায়, তাহার বিকৃতি ও পুনরুদ্ধার প্রভৃতি বহু তথ্য সম্বন্ধে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। গীতায় জ্ঞানের প্রশস্তিবর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানেই প্রকৃত মুক্তি—

ন হি জ্ঞানেন সদৃশ পবিত্রমিহ বিদ্যতে। ৪।৩৮

জ্ঞানের মত পবিত্র জিনিস এ জগতে আর কিছুই নাই।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ॥ ৪।১০

সংসারে আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, মন আমাতেই সঁপিয়া দিয়া, আমার শরণ লইয়া জ্ঞানরূপ তপস্যা করিয়া শুদ্ধ হইয়া বহুলোক আমাকে পাইয়াছেন অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে ইহার নিগলিতার্থ এই যে, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধমুক্ত, আমাময় অর্থাৎ

আমাকে নিজ হইতে অভিন্ন মনে করে যে সেইরূপ আমাতে সমাহিত অর্থাৎ আমাতে আশ্রয়কারী, জ্ঞানলাভ-রূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া বহু ব্যক্তি আমার ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ আমার জ্ঞানলাভ করিয়াছেন।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ৪।১১

হে পার্থ! যাহারা যে ভাবে আমাকে উপাসনা করে আমি তাহাদিগকে সেইভাবে অনুগৃহীত করি। মানুষ সকল প্রকারেই আমারই পথ অনুসরণ করে। এস্থানে উপাসনা অর্থে যেভাবে কাজ করে বুঝিতে হইবে। পূর্বশ্লোকে যেভাবে জ্ঞানলাভের চেষ্টার কথা বলা হইয়াছে, সেইভাবে কাজ করিলে প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সেইমতই ফল লাভ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতিকিল্বিষম্॥ ৪।২১

নিরাশী অর্থে যার হৃদয় হইতে ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ কামনাবিহীন, সংযতমনা, ভোগ্যদ্রব্যে আসক্তিশূন্য ব্যক্তি শরীর রক্ষার জন্যেই মাত্র কর্ম করিয়া পাপ লাভ করে না অর্থাৎ পাপভাগী হয় না।

অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৪।৩৬

সকল পাপী অপেক্ষাও তুমি যদি অধিক পাপী হও, তবুও সমস্ত পাপ জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে সাঁতরাইয়া যাইতে পারিবে। অবশ্য,

ইহার অর্থ এই নহে যে, জ্ঞানের বলে পাপ কাজকে পুণ্যরূপে প্রকাশ করিতে পারিবে।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪।৩৭

হে অর্জুন! যেমন প্রজ্জলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মে পরিণত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্মকে ভস্মীভূত করে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৪।৩৯

শ্রদ্ধাযুক্ত, উদ্যোগী ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণক্ষম ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করে! জ্ঞানলাভ করিয়া অতি শীঘ্রই পরমশান্তি লাভ করেন।

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ। ৭।১৭

এই সকল ব্যক্তির অর্থাৎ পুণ্যাত্মাদিগের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীকে আমি ভালবাসি অর্থাৎ আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং আমিও জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়।

জ্ঞানযোগ দ্বারা যে মুক্তিলাভ সম্ভব, সে সম্পর্কে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্যমব্যক্তং পর্যুপাসতে।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ১২।৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ১২।৪

অর্থাৎ যাহারা সর্বদা ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে রাগ ও দ্বেষরহিত, সকল প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত এবং ইন্দ্রীয়সংযমী, যাঁহারা শব্দাদি প্রমাণ-দ্বারা অপ্রতিপাদ্য, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর, সর্বব্যাপী, মনাতীত, কূটস্থ বা মায়াধিষ্ঠান (রাশি বা গিরিশৃঙ্গ অন্য অর্থে) অচ্যুতস্বরূপ এবং শাশ্বত নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। এই সকল জ্ঞানী আমার আত্মাই। এ সম্পর্কে সপ্তম অধ্যায়েও বর্ণিত হইয়াছে—

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ সঃ হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম॥ ৭।১৮

অর্থাৎ ইহারা সকলেই মহান্ এবং সকলেই আমার প্রিয়। কোন ভক্তই আমার অপ্রিয় নহেন; কিন্তু জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়; কারণ জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ—ইহা আমার স্থির প্রত্যয়। বাসুদেবে অর্থাৎ সেই পরমপুরুষে সমাহিতচিত্ত জ্ঞানী উৎকৃষ্ট গতিস্বরূপ আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, অর্থাৎ 'আমি ভগবান্ বাসুদেব, আমি স্বরূপতঃ অন্য নহি'—এই বুদ্ধি জ্ঞানীর সর্বদা দৃঢ় থাকে।

ভক্তির দ্বারাও যে মোক্ষলাভ হয় তাহা একাদশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪

অর্থাৎ কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তির দ্বারাই আমাকে অর্থাৎ পরম-পুরুষকে স্বরূপতঃ জানিতে, প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ করিতে এবং আমাময় সেই আমাতে বিলয়রূপ মোক্ষলাভ করিতে ভক্তগণ সমর্থ হন।

রাজযোগ দ্বারাও যে মোক্ষলাভ সম্ভব, সে সম্পর্কে গীতায় পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে—

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ॥ ৫।২৭
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ॥ ৫।২৮

অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে মনকে সরাইয়া লইয়া, চক্ষু দুইটি ভ্রূর মধ্যে স্থির নিবদ্ধ রাখিয়া একাগ্র চিত্ত হইয়া নাসিকার মধ্যে যে প্রাণবায়ু এবং অপানবায়ু আছে, তাহাকে সমান অবস্থায় রাখিয়া অর্থাৎ কুম্ভক করিয়া ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি সংযমপূর্বক ইচ্ছা, ভয় এবং ক্রোধকে বিদূরিত করিতে সমর্থ হইলে মানুষ জীবিত অবস্থাতেই মুক্তিলাভে সমর্থ হন।

সুতরাং জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং রাজযোগ প্রত্যেকটিই অন্যনিরপেক্ষ মোক্ষের পথ। এরূপ অপূর্ব সমন্বয়ের কথা অন্য কোন শাস্ত্রে এমন সুন্দরভাবে আলোচিত হয় নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবেরও **'যত মত তত পথ'**—এই উক্তির তাৎপর্য গীতাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

গীতায় জ্ঞানের স্বরূপ কি, এই তাৎপর্য বিশ্লেষণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইহা সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে সর্বভূতের সহিত আত্মার এবং ঈশ্বরের ঐক্য দর্শন হয়—

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৪।৩৫

অর্থাৎ আমার দ্বারা (পরমপুরুষ বা পরমাত্মার দ্বারা) উপদিষ্ট

সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে তুমি কদাচ মোহগ্রস্ত হইবে না; কারণ ব্রহ্মজ্ঞান একবার আয়ত্ত হইলে অজ্ঞানতা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয়, পুনরায় আসিতে পারে না। সেই জ্ঞান লাভ করিয়া তুমি ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্যন্ত ভূতসমূহকে স্বীয় আত্মাতে এবং আমাতে অর্থাৎ পরব্রহ্মে দেখিতে পাইবে। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয়—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯
যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০

অর্থাৎ নিজের মধ্যে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি (অর্থাৎ সমাধিবান পুরুষ) সকল ব্যাপারে সমভাব হইয়া সকল জীবের মধ্যে এবং নিজের মধ্যে সর্বভূতকে অর্থাৎ সকল জীবকে দেখেন।

সে-সকলের মধ্যে আমাকে দেখিতে (উপলব্ধি করিতে) পারেন এবং সকল প্রাণী আমারই মধ্যে আছে (তাহাদের পৃথক সত্তা নাই) ইহা বুঝিতে পারেন, আমি তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ হই, আর তিনিও আমার কাছে অদৃশ্য থাকেন না

গীতার জ্ঞান হইতেছে আত্মজ্ঞান। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্‌জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥ ৫।১৬

জ্ঞানের উদয় হওয়ায় যাঁহাদের অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়াছে (আলো যেরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করে), তাঁহাদের জ্ঞান সূর্যের ন্যায় পরম তত্ত্বকে

অর্থাৎ সেই পরমপুরুষকে দেখাইয়া দেয় অর্থাৎ প্রকাশিত করে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের দ্বারাই পরমপুরুষের দর্শনলাভ ঘটে।

কিভাবে এই জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে, শ্রদ্ধাবান, জিতেন্দ্রিয়, ভগবৎনিষ্ঠ ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করেন। এবং—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়মাত্মনঃ॥ ৪।৪০

অর্থাৎ জ্ঞানহীন শ্রদ্ধাশূন্য ও সন্দেহপরায়ণ ব্যক্তি বিনাশ বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সংশয়যুক্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই—কোন সুখও নাই।

গীতায় উক্ত হইয়াছে—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ১৩।৮
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুর্শনম্॥ ১৩।৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু॥ ১৩।১০
ময়ি চানন্য যোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি॥ ১৩।১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা॥ ১৩।১২

উৎকর্ষতা সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, দম্ভশূন্যতা, প্রাণিপীড়নে

অনিচ্ছা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বহিরন্তঃশৌচ অর্থাৎ মৃত্তিকা ও জলাদিদ্বারা বহিঃশৌচ এবং ভাবশুদ্ধি দ্বারা মনের রাগাদি মল অপনয়ণই অন্তঃশৌচ, মোক্ষমার্গে স্থিরতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সন্মার্গে পরিচালনা, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুতে বিরক্তি, অভিমান-শূন্যতা; জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃপুনঃ দোষ দর্শন, বিষয়ে অনাসক্তি, স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে মমত্বাভাব, শুভাশুভ প্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সাম্যভাব, পরমপুরুষই একমাত্র গতি—এই নিশ্চিতবুদ্ধির দ্বারা আমাতে অর্থাৎ পরমাত্মাতে অচলা ভক্তি, নির্জনবাস, প্রাকৃতজনের সংসর্গত্যাগ আত্মানাত্ম বিবেক, জ্ঞানে নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ-দর্শন-অর্থাৎ সর্বদাই আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা তত্ত্বজ্ঞানের ফলের আলোচনা, এই সকল আত্মজ্ঞানের সাধন বলিয়া কথিত হয়। ইহার বিপরীত মানিত্ব ও দাম্ভিকতাদি অজ্ঞান বলির্যা জ্ঞেয় এবং সংসার প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া পরিহার্য।

কর্ম-সন্ন্যাস যোগ

প্রয়োজনীয় কর্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে এবং যাহাকে সন্ন্যাস বলা হইয়াছে, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে।—গীতা এই ধ্যানবাদ যোগের সমর্থন করিয়াছেন। কর্মের ত্যাগের আসল উদ্দেশ্য হইল জ্ঞানলাভের জন্য প্রচেষ্টায় কোনরূপ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা আসিতে না দেওয়া। যোগের অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা (দিব্য-উপলব্ধি) চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ হইলে দুঃখের অবসান ঘটে—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের আটটি অঙ্গ। কোন কোন যোগী অপানবায়ুতে প্রাণবায়ু আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ প্রাণবায়ুতে অপানবায়ু আহুতি দেন, আবার কেহ কেহ প্রাণ ও অপান উভয়েরই গতিরুদ্ধ করিয়া প্রাণায়ামপরায়ণ হন অর্থাৎ প্রাণায়াম করেন। যোগসাধনা করিতে গেলে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতেই হবে, এমন কথা ঠিক নয়। প্রাণায়াম ব্যতিরেকেও যোগাভ্যাস করা যায়। তবে প্রাণায়াম যদি নিয়মিত অভ্যাস করা যায়, অতি স্বল্প সময় হইলেও, তদ্দ্বারা সাধনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ শ্রীঅরবিন্দের মতে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে বুদ্ধি বিশেষভাবে প্রখরতা লাভ করে এবং মস্তিষ্ক বিশেষ-ভাবে সতেজ হইয়া উঠে।

যোগ হইতেছে, অলৌকিক শক্তিকে আয়ত্ত করিবার একটি উপায়। বহু প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে পৌঁছাইবার উপায় হিসাবে যোগের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। যোগকে একপ্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীও বলা যাইতে পারে এবং কলাবিদ্যাও বলা চলে। বৈজ্ঞানিক

প্রণালী বলা হয় এই কারণে যে, ইহা দ্বারা মানুষের মধ্যে চিন্তা করিবার, অনুভব করিবার, ইচ্ছা শক্তি জাগাইবার এবং চেতনার অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্রিয়া করিবার জন্য একটি যে মনোযন্ত্র রহিয়াছে, তাহারই সর্বপ্রকার সন্ধান ইহার দ্বারা জানা যায় এবং কলাবিদ্যা বলা চলে এই কারণে যে, ইহা দ্বারা মনকে সম্পূর্ণ বশে আনিয়া তাহাকে অহংভাব হইতে পৃথক করিয়া লইবার এবং মূল আত্মার সহিত যুক্ত করিয়া দিবার কৌশল ইহাতে শিক্ষা দেয়।

যোগ সাধনার মূল বিষয়বস্তু হইল, চিত্ত যখন সকল আসক্তি ছাড়িয়া অচঞ্চল ও বিকারশূন্য হইয়া পড়ে, তখন ব্যক্তিসত্তাটি তাহার মধ্যেকার আত্মার সহিত মিলিত হইয়া তাহারই মূলগত আনন্দের অবস্থাতে স্থায়ীভাবে থাকিতে আরম্ভ করে।

গীতায় উক্ত হইয়াছে—

কাম্যানং কর্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ১৮।২

অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলপ্রদ অশ্বমেধাদি কাম্য কর্মের পরিত্যাগকেই (অনুষ্ঠানকেই) পণ্ডিতগণের কেহ কেহ কেহ সন্ন্যাস বলিয়া জানেন। যে সকল নিত্য বা নৈমিত্তিক কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাদের যে ফল অনুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগকে জ্ঞানীগণ ত্যাগ বলিয়া থাকেন।

এই সম্পর্কে গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে নিম্নোক্ত শ্লোক দ্রষ্টব্য—

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্যং কর্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ৬।১

অর্থাৎ যে কর্মফল সম্বন্ধে অতি ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া কর্তব্য বা করণীয় কাজ করিয়া যায় সে একাধারে সন্ন্যাসী ও কর্মকারী। অগ্নিসাধ্য ও অগ্নিনিরপেক্ষ কর্মত্যাগী অর্থাৎ সন্ন্যাসী কিম্বা যোগী নহেন। গীতার পঞ্চম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, মানুষের শ্রেয় অর্থাৎ পরমপুরুষকে লাভের পন্থা হইল জ্ঞানলাভের জন্য দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ করিয়া যাওয়া। এইভাবে কাজ করিবার জন্য মানুষকে জ্ঞানলাভের জন্যে মন একাগ্র রাখিতে হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মনকে একাগ্র রাখিবার প্রয়োজনীয়তা এবং তাহার জন্যে কি প্রচেষ্টার প্রয়োজন সম্পর্কে বলা হইয়াছে,, কর্তব্য বা করনীয় কর্ম মানুষকে করিতেই হইবে। অবশ্য সেই কর্তব্য কর্ম পালনের সময় মানুষকে কর্মফল সম্পর্কে অতি ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইবে।

এই যোগসাধনার নিয়ম সম্পর্কে গীতায় বর্ণিত হইয়াছে—

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ॥ ৬।৬

অর্থাৎ সুবুদ্ধিযুক্ত হওয়ার ফলে সুকর্ম করিয়া অপরের উপর নির্ভর না করিয়াই সংযতমনা ব্যক্তি নিজেই নিজের মঙ্গল সাধন করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু অসংযত ব্যক্তি অসংযত মনের তাড়নায় বিকৃতবুদ্ধি লইয়া কাজ করিয়া নিজেই নিজের অমঙ্গল ডাকিয়া আনেন।

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীর পরিগ্রহঃ॥ ৬।১০

অর্থাৎ নির্জন স্থানে যোগী একাকী অর্থাৎ নিঃসঙ্গ, নিরাকাঙ্ক্ষ ও

পরিগ্রহশূন্য হইয়া দেহ ও মন সংযমপূর্বক অন্তঃকরণ সতত সমাহিত করিবেন।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥ ৬।১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ৬।১২

চৈলাজিনকুশোত্তরম্ অর্থে চেলি, অজিন, কুশউত্তরম (অজিন অর্থে ব্যাঘ্র বা মৃগাচর্ম) অর্থাৎ উপর হইতে নীচে চেলী কাপড়, মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম ও কুশ অর্থাৎ প্রথমে নীচে কুশ বিছাইয়া, তাহার উপর মৃগ বা ব্যাঘ্রচর্ম ও তাহার উপর বস্ত্র বা চেলী বস্ত্র দেওয়া।

পবিত্রস্থানে নিশ্চল, না অতিউচ্চ, না অতিনিম্ন, কুশের উপর চর্ম তাহার উপরে কাপড় দিয়া নিজের আসন স্থাপন করিয়া, সেই আসনে উপবেশন করতঃ মন ও নিয়ন্ত্রিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি, মন এক বিষয়ে নিবিষ্ট করিয়া নিজের মনকে বিশুদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় লাভে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ সংযমপূর্বক চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত একাগ্রমনে যোগাভ্যাস করিবেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বুদ্ধদেব যোগাসনে বসিবার পূর্বে এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন—

ইহাসনে শুষ্যতে মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥

(বুদ্ধচরিত)

অর্থাৎ এই আসনেই আমার শরীর ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হউক, চর্ম, অস্থি, মাংস ধ্বংস হউক। আমার যাহা কাম্য সেই পরম প্রকৃতির জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত এই আসন আমি ত্যাগ করিব না।

গীতায় আরও নির্দেশ রহিয়াছে—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥ ৫।১১

অর্থাৎ যোগীগণ অত্যাসক্তি বর্জন করিয়া চিত্তশুদ্ধির জন্য দেহ, মন, বুদ্ধি ও মমতাবর্জিত ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা কর্ম করিয়া থাকেন।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

যে সর্বান্তর্যামী পরমপুরুষ হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি বা কর্মচেষ্টা যিনি এই সমগ্র বিশ্বে ব্যপ্ত আছেন, তাঁহাকে মানুষ স্বীয় বর্ণাশ্রমের কর্ম দ্বারা অর্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করে।

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরম্।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ৬।১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬।১৪

অর্থাৎ যোগী যখন যোগাভ্যাস করিবেন, তখন শরীর, মাথা ও ঘাড় সোজা এবং স্থির করিয়া রাখিবেন। তিনি কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া একাত্ম হইয়া আপন নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ

রাখিবেন। এইভাবে যোগী মনকে স্থির করিয়া নির্ভয়ে ব্রহ্মচারীর ন্যায় থাকিয়া, আমাতে (এখানে আমাতে বলিতে বিশ্বপ্রকৃতির সামগ্রিক ও আংশিক জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্মার উপলব্ধি বুঝাইতেছে) মন রাখিয়া, আমাকে একমাত্র লক্ষ্য মনে করিয়া, সংযত মনে আসনে উপবেশন করিবেন।

এইরূপ প্রচেষ্টার ফল কি হয়, তাহা পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ৬।১৫

সংযতমনা যোগী নিজেকে সর্বদাই এইভাবে যুক্ত রাখিয়া আমার স্বরূপভূত শ্রেষ্ঠ মুক্তিরূপ মনের প্রশান্তি লাভ করেন। নির্বাণ অর্থে এই-স্থানে মনের শ্রেষ্ঠতম মুক্তির কথা বলা হইয়াছে।

সেই মুক্তিলাভের পথে কিভাবে সকল বাধাবিপত্তি দূর করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তাহার নির্দেশ গীতায় আছে—

সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥ ৬।২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ৬।২৫

অর্থাৎ সকল আকাঙ্ক্ষাজাত অতি ইচ্ছা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া, মন দ্বারাই ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল দিক হইতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা ধীরে ধীরে মনকে বিরত বা নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং মনকে নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আর কিছুই চিন্তা করিবে না।

এইরূপ করার সময় যে বাধা আসিতে পারে তাহার কথা এবং তাহার প্রতিকার কি তাহাও পরবর্তী শ্লোকসমূহে বলা হইয়াছে—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ৬।২৬

চঞ্চল ও অস্থির মন যে—যে দিকে অর্থাৎ বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইবে সেই সেই দিক বা বিষয়সমূহ হইতে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাহাকে নিজের মধ্যেই বশীভূত করিয়া আনিবে।

ধ্যানযোগ কাহার হয় বা হয় না সে সম্পর্কে গীতায় বর্ণিত হইয়াছে—

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥ ৬।১৬

হে অর্জুন, অতিভোজনকারীর লক্ষ্যবস্তুর প্রাপ্তি ঘটে না, একান্ত ভাবে অনাহারী ব্যক্তিরও হয় না, যেমন অতিনিদ্রিতেরও হয় না, তেমনই অতিজাগরণকারীরও হয় না।

শরীরের ধর্ম কি ভাবে পালন করিতে হইবে এবং তাহা পালন করিলে কি ফল লাভ হয়, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বলা হইয়াছে—

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥ ৬।১৭

অর্থাৎ যিনি পরিমিত আহার ও বিহার করেন এবং মন্ত্রজপ ও শাস্ত্রপাঠাদি কার্যে পরিমিত প্রচেষ্টা করেন, যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ

নিয়মিত অর্থাৎ নিয়মিত এবং পরিমাণমত যিনি নিদ্রা গ্রহণ করেন এবং জাগরিত থাকেন, তাঁহার ধ্যান সংসার দুঃখের নাশক হয়।

এই যোগের পরিণত অবস্থার নামই সমাধি। সেই সমাধি সম্বন্ধে গীতার নির্দেশ এই যে,

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্তইত্যুচতে তদা॥ ৬।১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯॥

যখন নিয়ন্ত্রিত-মন নিজের মধ্যেই অবস্থান করে, সমস্ত অতিইচ্ছা হইতে নিবৃত্ত ব্যক্তি তখনই 'যুক্ত' ইহা কথিত হয়েন। এইরূপ যুক্ত অবস্থা কিরূপ তাহা উপমা দ্বারা পরবর্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, যেমন নিশ্চল বায়ুর মধ্যে অবস্থিত প্রদীপ বিচলিত হয় না, নিয়ন্ত্রিত-মন নিজের মনের সংযোগ সাধনে প্রচেষ্ট যোগীর ক্ষেত্রে সেটাই উপমা বলা হয়।

পরমপুরুষ অর্থাৎ আত্মা কিংবা ব্রহ্মের পূর্ণ উপলব্ধিতেই সাধারণত সিদ্ধিলাভ ঘটে। যে সমাধির অবস্থায় যাইয়া পৌঁছায়, ইহা সহজেই সে লাভ করে। সমাধি হইল পাতঞ্জল যোগের অষ্টপ্রকার অবস্থার শেষ অবস্থা। সমাধি হইল মূলতঃ এক প্রকৃত পরিণতির অবস্থা, বহু সাধনা এবং প্রয়াসের ফলে তাহা আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সে অবস্থা অতঃপর সাধক বা যোগী স্বইচ্ছায় আনিতে পারেন।

সমাধির প্রকারভেদ ও বহুপ্রকার। কিন্তু মূল কথা হইল পরমাত্মার সহিত আপনার অভেদত্ববোধ। সমাধি প্রধানতঃ দুই প্রকার—সবিকল্প এবং নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে সাধক কোন এক নির্দিষ্ট বিভাবনার

সঙ্গে নিজেকে একাত্মবোধ করেন এবং নির্বিকল্প সমাধিতে তেমন কোন বিভাবনাই থাকে না, এমনকি সেই পরমপুরুষেরও না।

এ ছাড়া সহজ সমাধি, ভাবসমাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার সমাধির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

গীতায় যে কর্মসমাধির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী এই যে—সব কিছুর মূলই হইল ব্রহ্ম (৪র্থ অধ্যায়, গীতা) এই চরম সত্যকে উপলব্ধি করিয়া কেহ যদি সেই চেতনাতেই সব কিছু কাজ করেন, তাহা হইলে, তিনি যাহা কিছুই করুন না কেন, সবই ব্রহ্মে সমর্পিত হইবে। তখন তাঁহার জীবনটা হইবে এক যজ্ঞস্বরূপ; সেস্থানে যজ্ঞের হোতা, যজ্ঞের আহুতি, যজ্ঞের অনুষ্ঠান, যজ্ঞাগ্নি—সবই সেই ব্রহ্ম। সমাধিতে যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, এইস্থানে সেই জিনিস ব্রহ্মোদ্দিষ্ট কর্মের মধ্যেই ঘটে। সেই কর্ম্মই তখন কর্মসমাধি রূপধারণ করে।

এই কারণে গীতায় বর্ণিত যোগ অবস্থা বিশেষ প্রশংসার্হ—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ৬।২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬।২২
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিন্নচেতসা॥ ৬।২৩

যে (সেই) অবস্থায় যোগসেবার (অভ্যাসের) দ্বারা রুদ্ধদ্বার মন (বিষয়সমূহ) হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যে (সেই) অবস্থায় নিজের দ্বারাই নিজেকে দেখিয়া নিজের মনেই তৃপ্তিলাভ করে। যে (সেই) অবস্থায় বুদ্ধি দ্বারাই মাত্র গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, পরম যে সুখ তাহা জানা যায়। এবং যে (সেই) অবস্থায় থাকিয়া সেইব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান হইতে বিচলিত হয়েন না। এবং যাহা লাভ করিয়া অন্য অন্য লাভকে তাহা হইতে অধিক মনে করেন না, যাহাতে অবস্থান করিয়া অধিক দুঃখেও বিচলিত হন না। সেই দুঃখ সংযোগের রহিতকে যোগপরিচয় হিসাবে জানিবে। নিরাশ ভাবশূন্য মন দ্বারা সেই যোগ অর্থাৎ মনের একাগ্রতা অধ্যবসায় সহকারে সাধন করাই কর্ত্তব্য।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্॥ ৬।২৭

প্রশান্তচিত্ত, মোহাদি ক্লেশরূপ রজোবৃত্তিশূন্য, নিষ্পাপ ও ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যোগীই পরমসুখ লাভ করেন।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ৬।২৮

এইভাবে সর্বদা নিজের মনকে যুক্ত করিয়া যোগীব্যক্তি পাপশূন্য হইয়া সহজেই ব্রহ্মের সান্নিধ্যরূপ অতিশয় সুখ লাভ করে।

এইভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া যোগী কি কি ফল লাভ করেন তাহা পরবর্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে—

সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ॥ ৬।২৯

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সবং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥ ৬।৩১
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ ৬।৩২

নিজের মধ্যে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সকল ব্যাপারে সমভাব হইয়া নিজেকে সকল জীবের মধ্যে এবং নিজের মধ্যে সকল জীবকে দেখেন। যে সকলের মধ্যে আমাকে দেখে এবং আমাতে সকলকে দেখিতে পায়, আমি তাহার অদৃশ্য বা অপ্রত্যক্ষ হই না, সে-ও আমার অদৃশ্য হয় না। যে একত্বে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ অভেদাত্মা হইয়া সকল সৃষ্টিতে অবস্থিত আমাকে ভজনা করে, সেই যোগী সকল-প্রকার অবস্থায় থাকিয়াও আমাতে বিদ্যমান থাকে। হে অর্জুন! যিনি সকলের ক্ষেত্রে নিজের সহিত তুলনা করিয়া সুখ বা দুঃখদায়ককে সমান-ভাবে দেখেন সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার অভিমত।

ভক্তিযোগ

ভক্তিবাদিগণের মতে যে ভক্ত কাহাকেও বিদ্বেষ করে না, পরম-পুরুষে অকুণ্ঠ বিশ্বাস রাখে, সকলকে ভালবাসে আর দয়া করে সে-ই পরমপুরুষের অত্যন্ত প্রিয়। পুরুষোত্তমের দর্শন অনন্তভক্তি হইতেই হয়; ইহা ভগবান বলার পর ভক্তির স্বরূপ ত সামনে আসাই চাই। গীতায় ভক্তিবাদের সমর্থনে বলিতেছেন—

চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ১৮।৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি॥ ১৮।৫৮

মনে মনে আমার উপর সকল কর্ম্মের ভার অর্থাৎ কর্মফল দিয়া একমনে আমারই সেবা করিয়া জ্ঞানযোগের পথে গিয়া, তুমি শুধু আমাতেই মনপ্রাণ সমর্পণ কর।

আমাতে চিত্ত অর্পণ করিলে আমার অনুগ্রহে তুমি দুস্তর সংসার এবং তাহার কারণসমূহ অতিক্রম করিবে। আর যদি তুমি পাণ্ডিত্যাভি-মানবশতঃ আমার কথা না শুন, তাহা হইলে তুমি পুরুষার্থের অযোগ্য হইবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭

অতএব হে কৌন্তেয়, যাহা অনুষ্ঠান কর, যাহা আহার কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর এবং যে তপস্যা কর, সে সকলই আমাকে সমর্পণ করিবে অর্থাৎ আমার উদ্দেশেই সমর্পণ করিবে।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈব মাত্মানং মৎপরায়ণঃ॥ ৯।৩৪

অর্থাৎ তুমি সমস্ত মন আমাতেই দাও, আমাকেই ভক্তি কর, আমার উদ্দেশেই যজ্ঞ কর, আমাকেই প্রণাম কর। এইভাবে একমাত্র আমারই সেবা করিয়া, আমাতেই মন দিয়া তুমি আমাকেই পাইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥ ২।৪৮

হে ধনঞ্জয়, যোগস্থ অবস্থায় অর্থাৎ নিরন্তর পরমপুরুষের কর্ম কর। যখন এইরূপ কর্মে নিরত থাকিবে তখনও যেন 'পরমপুরুষ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন'—এইরূপ বিন্দুমাত্র আশাও ত্যাগ করিতে হইবে। কর্তৃত্বাদি অভিনিবেশশূন্য হইয়া কার্য করিলে সত্ত্বশুদ্ধিজনিত জ্ঞানপ্রাপ্তি-রূপ সিদ্ধিতে হর্ষ এবং তদ্বিপর্যয়ে বিষাদ উপস্থিত হয়। উহাতে নির্বিকার থাকিয়া কর্মকর। ফলাফলে চিত্তের সমত্ব বা নির্বিকার ভাবই যোগ। অতএব—

মাঞ্চ যোঽব্য ভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬

অর্থাৎ যিনি আমাকে অবিচলিত অর্থাৎ পূর্ণ ভক্তি লইয়া সেবা

করেন, তিনি এইসব গুণের প্রভাব কাটাইয়া মোক্ষ বা মুক্তিলাভ করেন।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম॥
১৮।৬২

হে অর্জুন! তুমি একেবারে (সকল মনপ্রাণ দিয়া) তাঁহারই আশ্রয় লও। তবেই তাঁহার অর্থাৎ সেই পরম পুরুষের দয়ায় পরম শান্তি ও নিত্য শ্রেষ্ঠ পদ অর্থাৎ মুক্তি পাইতে পারিবে।

কর্মযোগনিষ্ঠার পরম রহস্যের উপদেশ উপসংহার করিয়া সন্ন্যাসের ফল সর্ববেদান্তবিহিত সম্যগ্‌দর্শন বলিতেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ১৮।৬৬

অর্থাৎ সকল প্রকার ধর্ম অধর্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া শুধু তুমি আমারই স্মরণ বা আশ্রয় লও অর্থাৎ আমি ব্যতীত আর কেহ বা কিছু নাই বলিয়া মনে বিশ্বাস কর। তুমি যদি এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধিযুক্ত এবং স্মরণশীল হও, তাহা হইলে তোমার আর আমার মধ্যে কোনরূপ ভেদ না রাখিয়া তোমাকে সকল ধর্মাধর্ম পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব কোন শোক বা চিন্তা করিও না। এস্থানে 'মামেকং' অর্থটিকে বিশ্লেশণ করিলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় যে, পরমাত্মাই জীবের মূল। মানবদেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যে 'আমার' সৃষ্টি, যতক্ষণ পরমাত্মার প্রেরণা থাকে, ততক্ষণই তাহা সক্রিয় থাকে, তাহার

সত্ত্বাতেই মানবাত্মার সত্ত্বা অন্যথায় তাহার কোন অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব সেই 'আমি' কে তাহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের প্রয়োজন। কারণ মানুষের মৃত্যু অর্থাৎ পরলোকপ্রাপ্তির পর যদিও কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিচ্যুত না হইলে সেই মানব তখন কোনরূপ করা, চলা,, বলা—কিছুই করিতে পারে না, যে পরমাত্মা তাহাতে অধিষ্ঠান করে যাহা মানুষকে করায়, বলায়, প্রেরণা জোগায় তাহার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। সেই পরমাত্মাকেই প্রথমে উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। মাম+একং শব্দগত অর্থ হইল একমাত্র আমাকে অর্থাৎ গর্ভ-জন্ম-জরা মৃত্যুর্বজিত সর্বাত্মা পরমপুরুষ।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎতপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭
শুভাশুভ ফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ৯।২৮

হে কৌন্তেয় অর্থাৎ অর্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যে যজ্ঞ বা দান কর, অথবা যে তপস্যা কর, সে সবই আমাকেই দাও অর্থাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কর। এইভাবে আমাতে সমস্ত কর্ম অর্পণ দ্বারা কর্মের শুভ বা অশুভ যে ফল অর্থাৎ যদ্দ্বারা সংসারে বন্ধন অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা হইতে মুক্তি পাইবে। এইভাবে আমাতে শুভাশুভ কমসমর্পণরূপ সন্ন্যাসযোগে যুক্ত হইয়া জীবিতকালেই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং দেহান্তে আমাকে লাভ করিবে অর্থাৎ দেহান্তে পুনরায় দেহধারণ করিতে হইবে না।

যাহারা একান্ত বিশ্বাসে ভক্তিপূর্ণভাবে আমার আরাধনা করেন

তাঁহারা আমাতেই অবস্থান করেন এবং আমিও সেই সকল ভক্তে অবস্থান করি।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৯।৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥ ৯।৩১

অতি দুষ্ট লোকও যদি অনন্যমন হইয়া আমার সেবা করে, তবে তাহাকেও লোকে সাধু বলিয়া মনে করে বা সাধু বলিয়া গণ্য হয়; কারণ তাহার সঙ্কল্প বা চেষ্টা সাধু। সেই দুষ্ট অথচ আমার একান্ত ভক্ত লোকটি শীঘ্রই ধার্মিক হইয়া যায় এবং চিরশান্তি পায়। হে অর্জুন! তুমি নির্ভয়ে প্রতি জনকে অবহিত কর যে, যে আমার ভক্ত তাহার কখনও ক্ষয় নাই অর্থাৎ সে কখনও বিনষ্ট হয় না।

ভক্ত সম্বন্ধে গীতায় আরও উল্লেখ করিয়াছে যে—

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংনস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥ ১২॥৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ ১২।৭

যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত কর্ম অর্থাৎ কর্মফল আমাকে সমর্পণ করিয়া, একমাত্র আমাতেই লক্ষ্য রাখিয়া, একনিষ্ঠ ভক্তি লইয়া আমার ধ্যান এবং উপাসনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে অল্পকাল মধ্যেই সংসার সাগর (জন্ম মৃত্যুর বন্ধন) হইতে উদ্ধার করি।

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ১০।৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

যাঁহারা মনপ্রাণ আমাকেই দিয়াছেন—যাঁহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমাতে উপসংহৃত হইয়াছে, তাঁহারা নিজেদের মধ্যে আমার কথা আলোচনা করিয়া এবং আমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া সন্তোষ ও আনন্দলাভ করেন। এই ভক্তগণ সর্বদাই আমাতে মন রাখিয়া আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া সেবা করেন। তাই আমি এই সব লোককে এমন জ্ঞানদান করি যে, এই সম্যক জ্ঞানের দ্বারা তাঁহারা আমাকে আত্মরূপে উপলব্ধি করেন। এই সব ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহবশেই আমি তাঁহাদের বুদ্ধিতে (অন্তঃকরণে) থাকিয়া (অধিষ্ঠিত হইয়া) উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিই।

সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্। ৯।২৯

সর্বভূতে আমি সমভাবেই বিচরণ করি—আমি সকলকেই ভালবাসি। (বিশেষ) ভালবাসা বা (বিশেষ) বিদ্বেষ কারও প্রতি আমার নাই। কিন্তু যাহারা ভক্তিপূর্বক আমাকে ভজনা করেন, আমি তাহাদের অনুগ্রহ করি অর্থাৎ তাহাদের ছাড়িয়া যাই না আবার

তাহারাও আমাকে ছাড়িয়া যায় না। (এটি আমার পক্ষপাত নয়, এটি আমার ভক্তির মহিমা)।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্ধ্বং ন সংশয়ঃ। ১২।৮

সুতরাং আমাতেই মন সমর্পণ কর, আমাতেই বুদ্ধি স্থাপন কর; এই-রূপ করিলে দেহান্তে আমাতেই অবস্থান করিবে, এ বিষয়ে কোন সংশয়ই নাই।

অতএব গীতাও যে নিঃসংশয়ে ভক্তিবাদের সমর্থন করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু গীতার এই ভক্তিবাদ জ্ঞান, কর্ম্ম বা ধ্যান-বাদের বিরোধী নয়, তাই গীতায় বলা হইয়াছে—

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ ৭।১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭।১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ৭।১৮

হে ভারতকুলগৌরব অর্জুন, রোগ, ভয় ইত্যাদিতে কাতর, ভগবানের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, ধনলাভ করিতে ইচ্ছুক এবং তত্ত্বজ্ঞানী—এই চারি-প্রকার পুণ্যকর্মা ব্যক্তিগণই আমার ভজনা করেন। এই চারিপ্রকার পুণ্যাত্মালোকের মধ্যে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীকে অত্যন্ত ভালবাসি এবং জ্ঞানীও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কারণ তিনি মৎস্বরূপ প্রাপ্ত। (অর্থাৎ বাসুদেব জ্ঞানীর আত্মা বলিয়া তাঁহার

প্রিয় এবং জ্ঞানীও বাসুদেবের আত্মা বলিয়া তাঁহার প্রিয়)। এই চারি প্রকার পুণ্যাত্মা সকলেই মহান্ তবে জ্ঞানী আমারই আত্মা (আমা হইতে পৃথক নহেন)। কারণ, তিনি একমন হইয়া (অর্থাৎ আমাতে যুক্তাত্মা হইয়া) আমিই একমাত্র গতি মনে করিয়া আমারই শরণ লন।

সুতরাং গীতার উপদেশ হইল ঈশ্বরে কর্ম্মপণ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্যে কর্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আত্মবিশ্বাস এবং পরিপূর্ণ-রূপে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে প্রকৃত ভক্ত হওয়া সম্ভব নহে। অনন্য ভক্তি বলিতে বুঝায়, যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে, ঈশ্বরকেই পরম আশ্রয় জানে, ঈশ্বরে ভক্তি রাখে ও আসক্তি ত্যাগ করে, যে সর্ব প্রাণীতে বৈর-বোধ-শূণ্য সেই ভক্ত, সেই পরমপুরুষকে লাভ করে। অতএব কর্ম্ম এবং ভক্তির মধ্যে কোন বিরোধ থাকিতে পারে না।

জ্ঞান ও কর্ম্মের ন্যায় ধ্যানবাদের সহিতও ভক্তিবাদের কোনরূপ বিরোধ নাই। ধ্যানবাদীগণের মতে চিত্ত-বৃত্তি নিরোধই মুক্তিলাভের উপায় এবং তাহা প্রশমিত বা নিরোধ করিবার বিভিন্ন পন্থার মধ্যে ঈশ্বর প্রণিধান অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের উপলব্ধিই অন্যতম। যদিও ধ্যানবাদিগণের অনুসৃত পন্থায় ঈশ্বরের স্থান গৌণ। কিন্তু গীতায় যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে পরম শক্তির আধার পরমপুরুষকে বাদ দিয়া কোন কিছু করিবার উপায় নাই।

ধ্যানবাদিগণের কর্তব্য সম্বন্ধে নানবিধ উপদেশ দিয়া গীতায় উক্ত হইয়াছে—

মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥ ৬।১৪

মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ যোগী মন একাগ্র করিয়া নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিবেন। যোগের ফল বলিতেছেন—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥ ৬।১৫

যোগী বা সাধক এইভাবে সদা সংযত অবস্থায় মন সমাহিত করিয়া আমার স্বরূপভূত মোক্ষপ্রদ পরমশান্তি প্রাপ্ত হন।

গীতা আরও বলিতেছে—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ ৬।৪৭

যোগীদের মধ্যে আবার যে যোগী ভক্তির সঙ্গে আমাতেই চিত্ত সমাহিত রাখিয়া আমার সেবা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ যোগী, ইহাই আমার অভিমত। অর্থাৎ "যিনি শ্রীভগবানের সগুণ বা নির্গুন স্বরূপ যথোক্ত চিত্তে শ্রদ্ধাপূর্বক অনবরত অনুসন্ধান করেন, তিনি যোগযুক্ত-গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যুক্ত (শ্রেষ্ঠ)- ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রায়। সিদ্ধ-সংকল্প ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের কখনও অন্যথা হয় না।"—আনন্দগিরি।

অতএব ইহার দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, গীতাকথিত জ্ঞান, কর্ম বা ধ্যান প্রভৃতির সহিত ভক্তির কোনরূপ বিরোধ নাই।

যে পূর্ণভাবে বৈর ত্যাগ করিয়াছে, যে সকলের মিত্র, যাহার সকলের প্রতি দয়া আছে, অথচ মমতা নাই; সুখ-দুঃখে সমতাবোধ যাহার হইয়াছে, সে সকলকেই ক্ষমা করিতে পারে, যাহার মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সন্তোষ বিদ্যমান, ঈশ্বরের সহিত যোগে যে যুক্ত, ইন্দ্রিয় যার নিগৃহীত, যে দৃঢ়নিশ্চয়, যে মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে, যাহার মানসিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও যাহার কর্ম্মপ্রেরক বুদ্ধি সকলই ঈশ্বরে অর্পিত, সেই ঈশ্বরের প্রিয় ভক্ত। সে সম্পর্কে গীতা বলিতেছেন—

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥ ১২।১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৪

গীতায় উক্ত হইয়াছে—

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৫

অর্থাৎ যিনি কাহাকেও কোন পীড়া (কষ্ট) দেন না, এবং কাহারও কোন ব্যবহারে যিনি কষ্ট পান না, যিনি আনন্দ, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ—এই সব হইতে মুক্ত তিনিই আমার প্রিয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়॥ ১২।১৬

অর্থাৎ যিনি কিছুই চান না, যিনি শরীরে ও মনে পবিত্র, যাহার আলস্য নাই, যাঁহার সকলের প্রতি দৃষ্টি সমান, যাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই, যিনি সব রকম কর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়।

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১২।১৭

অর্থাৎ যিনি ইষ্টপ্রাপ্তিতে হৃষ্ট হন না, অনিষ্টপ্রাপ্তিতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বিয়োগে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত ইষ্টবস্তু আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং শুভাশুভ সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১২।১৮

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১২।১৯

অর্থাৎ যিনি শত্রুমিত্র অভেদজ্ঞানে সমদৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার কাছে মান ও অপমান সমান, যিনি শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখে বিচলিত হন না, যাঁহার কিছুতেই আসক্তি নাই, যাঁহার নিন্দা বা প্রশংসায় মনের একই ভাব, যাহার কথা সংযত [অর্থাৎ যিনি কম কথা বলেন], যাহা কিছু পান তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, যাঁহার কোন বাসের স্থান নির্দিষ্ট নাই [অর্থাৎ যিনি যেখানে সেখানে থাকেন], যাঁহার বুদ্ধি স্থির অর্থাৎ চঞ্চল নয়, তিনি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভক্ত।

যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ১২।২০

আমি এই যে ধর্মের কথা বলিলাম, সেই ধর্ম যিনি পালন (আচরণ) করেন, যাঁহার আমাতে শ্রদ্ধা আছে এবং যিনি আমাকেই একমাত্র আশ্রয় বা অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয়।

পুরুষ ও প্রকৃতি

পরমপুরুষ বা পরমাত্মা বা পরমেশ্বর হইতেই জগতের সৃষ্টি। সৃষ্টি ব্যাপারে তাঁহার দুইভাব ক্রিয়াশীল—এক পুরুষ এবং অপরটি প্রকৃতি। একটি সদা চঞ্চল, লীলায়িত ছন্দে ছন্দিত, অপরটি ধীর, স্থির, অচঞ্চল। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। প্রকৃতি তাঁহার নিজের সৃষ্টি—২৩টি তত্ত্বের সাহায্যে গঠন করিতেছে, পরিবর্তন করিতেছে।

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥ ৭।৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥ ৭।৬

হে মহাবাহো অর্থাৎ মহাবীর, এই প্রকৃতির নাম অপরা (নিকৃষ্ট, জড়) প্রকৃতি। ইহা ভিন্ন আমার আর একটি প্রকৃতি আছে, তাহার নাম পরা (শ্রেষ্ঠা) প্রকৃতি। এই জীবরূপ প্রকৃতি সমগ্র জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ঐ পরা এবং অপরা প্রকৃতি হইতেই সকল প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। সমগ্র জগতের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মূল কারণ আমিই।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ১৩।২০

শ্রীভগবান সপ্তম অধ্যায়ের ৪, ৫ এবং ৬ শ্লোকে বলিয়াছেন যে, সর্বভূত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে জাত, এখানে তাহারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলিতেছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া

জানিবে। বুদ্ধ্যাদি দেহেন্দ্রিয় পর্যন্ত বিকারসমূহ এবং সুখ-দুঃখ ও মোহাত্মক গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে।

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ১৪।৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥ ১৪।৪

হে অর্জুন! প্রকৃতি আমার গর্ভাধানের অর্থাৎ সৃষ্টির স্থান, তাহাতে আমি বীজ নিক্ষেপ করি। তাহা হইতে সকল জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মানুষ প্রভৃতি যে-কোন প্রাণীই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, আমি তাহাদের পিতা এবং প্রকৃতি তাহাদের মাতা।

অতএব প্রকৃতি একা থাকিতে পারে না, একা কর্ম সম্পাদন করিতে পারে না। উহার সহায়ক জীব ভাব বা পুরুষের সঙ্গ চাই। প্রকৃতি ব্যতীত পুরুষের বিদ্যমানতা নাই, পুরুষ ব্যতীত প্রকৃতির বিদ্যমানতা নাই। যে স্থানে একটি আছে, সেই স্থানে অপরটিও আছে। পরমাত্মা অখণ্ড; তাঁহার সৃষ্টিতে তাঁহাকে যে দুইভাবে পাওয়া যায়, অর্থাৎ তাঁহার পুরুষ ও প্রকৃতি ভাব তাহাও অচ্ছেদ্য-অখণ্ড। প্রকৃতি গঠন করিতেছে, পরিবর্ত্তন করিতেছে ও ধ্বংস করিতেছে এবং তাহার সান্নিধ্যে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই জীব ভাব দ্রষ্টারূপে, ভোক্তা- রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঈশ্বরতত্ত্ব কি ?

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসিতচ্ছৃণু॥ ৭।১
জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভুয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে॥ ৭।২
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭।৩

অর্থাৎ পরমপুরুষ বলিলেন—

হে অর্জুন, একমাত্র আমাতে মন রাখিয়া এবং আমাকেই আশ্রয় বলিয়া ভাবিয়া যোগ অভ্যাস করিতে করিতে যোগী আমাকে যে ভাবে জানিতে পারে, তাহা বলিতেছি শুন। এই জ্ঞান পুরোপুরি হয় এবং ইহাতে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। আমি প্রত্যক্ষ অনুভবের দ্বারা প্রাপ্ত আমার সম্পর্কীয় শাস্ত্রীয় জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি। এই জ্ঞান জন্মিলে আর কোন কিছুই জানিবার থাকে না। হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধিলাভের (মুক্তি-লাভের) জন্য চেষ্টা করেন। আর যাঁহারা এই রকম চেষ্টা করেন, তেমনি হাজার হাজার লোকের মধ্যে আবার কদাচিৎ একজন আমাকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন।

ঈশ্বরই প্রকৃতি-পুরুষ রূপে জগতের স্রষ্টা। মহাভূত পাঁচটি—ভূমি, অপ্‌, অনল, বায়ু, খ অথবা ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ইহাদের সহিত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই তিন পদার্থ যুক্ত হইয়া যে আট পদার্থ হয়, তাহাকেই ঈশ্বরের প্রকৃতি বলে।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি ঘটিলে পুনর্জন্মের বারণ হয় এবং সাংসারিক মায়া অতিক্রম করা যায়—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ৮।১৬

হে অর্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে এই পৃথিবী পর্যন্ত সপ্তলোক অর্থাৎ সকল স্থানের লোকেরাই বার বার জন্ম লয় এবং মরে; কিন্তু যিনি আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না অর্থাৎ তিনি মুক্তিলাভ করেন, (সপ্তলোক = ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ ও সত্যলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক।)

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ৮।১৫

অর্থাৎ মহাত্মারা আমাকে পাইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করেন। তাই জন্ম লইয়া এই দুঃখময়, অনিত্য সংসারে তাঁহাদের আর আসিতে হয় না।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। ৭।১৪

অর্থাৎ যাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁহারাই কেবল আমার এই দুস্তর মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, অর্থাৎ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন। অতএব সেই পরমপুরুষের অনুগ্রহপ্রসাদে পরমশান্তি এবং নিত্যপদপ্রাপ্ত হওয়া যায়—

সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌॥ ১৮।৫৬

অর্থাৎ সর্বদা সর্বপ্রকার কর্ম করিয়াও একান্তমনে আমারই আশ্রয় লইয়া ভক্ত আমারই কৃপায় সেই নিত্য পরমপদ অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।

মোক্ষপ্রাপ্তির পথ

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিন বৃত্তি একে অন্যের হাতে হাত দিয়া জীবকে মোক্ষের পথে লইয়া যায়। একটি না থাকিলে অপর দুইটি অচল। কর্ম ব্যতীত জ্ঞান প্রাপ্তি দুরূহ। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম ও ভক্তি যথাযথ হয় না। ভক্তি না থাকিলে জ্ঞান-কর্মের পুরুষ-প্রচেষ্টা মিথ্যা। কেবলমাত্র জ্ঞানের পথেও মোক্ষ পাওয়া যায় বটে। তবে সে পথ কঠিন। জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছিন্ন করিয়া কর্ম করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তবুও ঈশ্বরের কৃপা চাই। অনন্য ভক্তি দ্বারা ঐ কৃপা পাওয়া যায়।

ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে গীতা বলেন—

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভুতানি যেন সর্বমিদং ততম্॥ ৮।২২

হে অর্জুন, সকল জগৎ যাঁহার মধ্যে আছে, আর যিনি সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই পরমপুরুষকে শুধু একনিষ্ঠ ভক্তি সহযোগেই পাওয়া যায়।

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভুতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৯।৪
ন চ মৎস্থানি ভুতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভুতভৃন্ন চ ভুতস্থো মমাত্মা ভুতভাবনঃ॥ ৯।৫

অর্থাৎ আমার যে মূর্তি অপ্রকাশিত, আমি সেই মূর্তিতে এই জগৎ ব্যাপিয়া আছি। সকল প্রাণী আমাতেই আছে। কিন্তু আমি তাহাদের মধ্যে নাই। প্রকৃতপক্ষে জীবগণ যে আমাতে অবস্থিত তাহাও নয়।

সর্বভূতস্থমাত্মানাং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ৬।২৯

এইটিই আমার অলৌকিক মাহাত্ম্য যে, আমি প্রাণীদের ধারণ করি ও পালন করি, তবু আমি তাহাদের মধ্যে নাই (কারণ আমি নির্লিপ্ত)।

যোগী যোগদ্বারা তাঁহার মনকে স্থির করিতে পারেন, তখন সকল বিষয়ে তাঁহার সমান দৃষ্টি হয়। তখন তিনি সকল জীবের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং আত্মাতে সকল জীব আছে, তাহা বুঝিতে পারেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৯।৩৪

অর্থাৎ তুমি সমস্ত মন আমাতেই দাও, আমাকেই ভক্তি কর, আমার উদ্দেশ্যেই যজ্ঞ কর, আমাকেই প্রণাম কর। এইভাবে একমাত্র আমারই সেবা করিয়া, আমাতেই মন দিয়া তুমি আমাকেই পাইবে।

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥ ১১।৫৫

হে অর্জুন, যিনি আমারই জন্য কর্ম করেন, আমাকেই যিনি পরম গতি বলিয়া আশ্রয় লইয়াছেন, যিনি একমনে আমারই ভজনা করেন, যাঁহার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিতে আসক্তি নাই, যিনি সর্বভূতে, এমনকি অত্যন্ত অপকারীর প্রতিও বৈরভাববিহীন, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন।

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫

উক্ত জ্ঞানরূপ ভক্তিদ্বারা তিনি জানিতে পারেন—আমি প্রকৃতপক্ষে কে এবং আমার মাহাত্ম্য কি! এইরূপে আমার স্বরূপ জানিতে পারিয়া অতঃপর তিনি আমাতেই অনুপ্রবেশ করেন।

অনন্ত ভক্তি দ্বারা ঈশ্বর যে লভ্য সে সম্পর্কে গীতার নির্দেশ—

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ৭।২৮

যে সকল পুণ্যবান্ লোকের পাপ কাটিয়া গিয়াছে, তাঁহারাই ঐ সুখদুঃখ হইতে যে মোহ জন্মে, তাহা এড়াইয়া, মনের বল নিয়া আমারই সেবা করিয়া থাকেন।

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ ৮।৭

তাই তুমি সর্বদাই আমার কথা ভাব, আর (কর্তব্যকর্ম) যুদ্ধও কর। আমার উপর মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিলে আমাকেই পাইবে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪

হে অর্জুন! যিনি সর্বদা একমনে যাবজ্জীবন আমার কথাই ভাবেন, সর্বদা সমাহিত, সেই যোগী আমাকে সহজেই পাইয়া থাকেন।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম ॥ ৯।২২

যাঁহারা অন্য কামনা ত্যাগ করিয়া একমনে আমারই কথা ভাবেন

আর সর্বদা আমারই উপাসনা করেন, সেই ভক্তদের আমি ইহলোকে কল্যাণ ও পরলোকে মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকি।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা॥ ১০।১১

এই ভক্তগণ সর্বদাই আমাতে মন রাখিয়া আমাকে শ্রদ্ধা করিয়া সেবা করেন। তাই আমি এইসব লোককে এমন জ্ঞান দেই যাহার ফলে তাঁহারা আমাকে পান। এইসব ভক্তদের প্রতি দয়া করিয়া আমি তাঁহাদের বুদ্ধিতে (অন্তঃকরণে) থাকিয়া (অধিষ্ঠিত হইয়া) উজ্জ্বল জ্ঞানের আলোকে অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দেই।

অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া শেষ দুই শ্লোকে তেমনই অনন্য ভক্তির আশ্রয় লওয়ার জন্যই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে—(শেষ শ্লোক পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে);

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুংচ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥ ১১।৫৪

হে মহাবীর অর্জুন! শুধু একমনে আমাকে ভক্তি করিলেই আমার এই রূপ ভাল করিয়া জানিতে, দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায় (অন্য কোনো উপায়ে পারা যায় না)।

ব্রহ্ম (ঈশ্বর)

উপনিষদ বলিয়াছে প্রজ্ঞান অবস্থার কথা, যদ্বারা সর্বপ্রকার সাধারণ অনুভূতি বিলীন হইয়া তাহা একটিমাত্র অদ্বৈত ভাবের বিরাট ও অসীম সমগুণী অনুভূতিতে আসিয়া পৌঁছায়। এই অবস্থাই হইল আত্মার চিন্তাবিরহিত বোধির অবস্থা যাহাতে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়—এই তিনই একীভূত হইয়া যায়। এস্থানে বা ক্ষেত্রে আর ব্যক্তিগত ঈশ্বরের কোন প্রশ্ন থাকে না। ইহা একটি সহজ ও ভেদাভেদশূন্য অনুভূতির সর্বসমন্বয়ী অবস্থা, যে স্থান হইতে আমাদের সর্বপ্রকার চেতনা এবং জ্ঞানের মূল উৎপত্তি। ইহাকেই বলা হয় ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, যাহা আমাদের ব্যক্তিগত সত্তার ও সকল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি উৎস। ব্রহ্মজ্ঞ-দিগের মধ্যে তিনিই গরিষ্ঠ যিনি আত্মার সহিত লীলায় নিযুক্ত হইয়া থাকেন, যিনি প্রেমে আত্মার মধ্যে বিলীন হইয়াও ক্রিয়া করিতে থাকেন।

ব্রহ্ম-কল্পনা গীতায় নানাস্থানে বিবৃত করা হইয়াছে এবং নানাভাবে নানাভাষায় অব্যক্ত অচিন্তনীয় ও নির্গুণকে নির্দেশ করা হইয়াছে। 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগে' ব্রহ্মকে জ্ঞেয় বলিয়া অভিহিত করিয়া কয়েকটি শ্লোকে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাই গীতায় ঈশ্বরবাদের সারতত্ত্ব। ব্রহ্মকে কোন শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। তিনি সৎও নহেন, অসৎও নহেন—এমনই গুণাতীত তাঁহার স্বরূপ। ব্রহ্ম সর্বত্রই বিদ্যমান। ব্রহ্ম সম্বন্ধে গীতার প্রধান ভাষ্য—

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং। ৮।৩

অর্থাৎ পরম যে অক্ষর অর্থাৎ যাঁহার ক্ষয় নাই, তিনিই ব্রহ্ম।

'এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ, = বৃহদারণ্যক উপ ৩।৮।৯—অর্থাৎ হে গার্গি, এই অক্ষর ব্রহ্মের শাসনে সূর্য ও চন্দ্র বিধৃত রহিয়াছে।

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩।১৩
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্‌।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩।১৪
সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্‌।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৩।১৫
বহিরন্তশ্চ ভুতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মাত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৩।১৬

অর্থাৎ জ্ঞেয় কাহাকে বলে, এখন বলি শুন। ইহা জ্ঞাত হইলে অমৃত (মুক্তি) লাভ করা যায়। এই জ্ঞেয় বস্তুর আদি নাই, ইনি পরম ব্রহ্ম, ইনি সৎ (প্রকাশিত, ব্যক্ত) বা অসৎ (অপ্রকাশিত, অব্যক্ত) কিছুই নহেন—ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াতীত (কেন উপ—১।৪দ্রঃ)। পরব্রহ্ম সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান। পরব্রহ্মের চারিদিকেই হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ এবং কর্ম প্রসারিত (ব্যাপ্ত)। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া মনে হয়, তবু তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই নাই (আপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বিশ্বং ন হি তস্য বেত্তা তমাহুরাদ্যাঃ পুরুষং পুরাণম্‌॥) তাঁহার কাহারও সঙ্গে সম্পর্ক নাই, তবুও তিনি সকলকে ধরিয়া আছেন। তিনি নির্গুণ, তবুও তিনি সত্ত্ব প্রভৃতি গুণের পালন করেন। জীবের অন্তরে অর্থাৎ আত্মারূপে

এবং বাহিরে অর্থাৎ জগৎরূপে তিনি বিরাজিত। তিনি স্থাবর ও জঙ্গমরূপেও বিরাজিত অর্থাৎ সেসকলও তিনি ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। তিনি অ-জ্ঞানীর অজ্ঞাত বলিয়া বহুদূরে এবং আত্মস্বরূপে জ্ঞাত বলিয়া জ্ঞানীর অতি নিকটে।

ব্রহ্ম অখণ্ড ও অবিভক্ত হইলেও তিনি প্রাণী মধ্যে, ভূত মধ্যে, বিভক্তের ন্যায় রহিয়াছেন। তিনিই ভূতগণের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্তা।

সর্বব্যাপী একমাত্র ব্রহ্ম পদার্থই গীতা স্বীকার করিয়াছেন, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কিছুই নাই। যাহা বস্তুরূপে, যাহা গুণরূপে দেখা যায়, তাহা তিনিই, তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া শ্রৌত যজ্ঞাদি করা হয়। যজ্ঞের প্রত্যেক উপকরণই যে ব্রহ্ম ইহা স্মরণ রাখা চাই।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্‌।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা॥ ৪।২৪

ব্রহ্মবিৎ অর্থাৎ জ্ঞানযোগীর যখন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে তখন তিনি জগতে যাহা কিছু দেখেন বা করেন, তাহা সবই ব্রহ্ম। এইরূপে তাহার নিকট যজ্ঞের পাত্রটি ব্রহ্ম, যজ্ঞের ঘৃতও ব্রহ্ম, যজ্ঞের অগ্নি ব্রহ্ম, যিনি যজ্ঞ করেন তিনিও ব্রহ্ম। এইভাবে তাঁহার কর্মেও ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান হয়। সুতরাং তিনি ব্রহ্মকেই লাভ করেন। কারণ যখন সবই ব্রহ্ম তখন অর্পণাদিকে বিশেষভাবে ব্রহ্ম বলার উদ্দেশ্য জ্ঞানের যজ্ঞত্ব সম্পাদন। সর্বকর্মসন্ন্যাসীর সম্যগ্‌দর্শনের স্তুতির জন্যে এই যজ্ঞ সম্পাদন। যজ্ঞে অর্পণাদি বলিয়া যাহা প্রসিদ্ধ, সম্যগদর্শীর দৃষ্টিতে তাহা ব্রহ্মই। সম্যগদর্শনই জ্ঞানীর যজ্ঞ। প্রতিমাদিতে বিষ্ণুবুদ্ধি ও নামে ব্রহ্মবুদ্ধির ন্যায় যজ্ঞে ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মদৃষ্টি করেন।

তিনিই অধিভূত অর্থাৎ বিনাশশীল বস্তুতে পরিণত, তিনিই অধিদৈবত, অর্থাৎ ব্রহ্মই এই দেহে প্রকৃতির গুণ-সংস্পৃষ্ট মলিন আত্মা-রূপে অবস্থিত, তিনিই অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা শুদ্ধ গুণদ্বারা অস্পৃষ্ট আত্মা।

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর॥ ৮।৪

হে অর্জুন! শরীর ইত্যাদিতে যে সব জিনিস নষ্ট হইবেই, তাহাকে অধিভূত অর্থাৎ যে সকল দেহাদি নশ্বর পদার্থ প্রাণিমাত্রকে অধিকার করিয়া আছে, তাহাদিগকে অধিভূত বলে এবং যে পুরুষ মর প্রাণীকে অনুগ্রহ করেন, সেই হিরণ্যগর্ভ হইলেন অধিদৈব অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলস্থ যে বিরাট পুরুষ স্বীয় অংশভূত সর্বদেবতার অধিপতি, তাঁহাকে অধিদৈবত বলে। অধিদেবত অর্থাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যথা—

(১) **স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে।**
আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত॥
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৪৫।৬৪

অর্থাৎ তিনি প্রথম শরীরী, তাঁহাকে পুরুষ বলা হয়। সর্বভূতের আদিকর্তা সেই ব্রহ্মা প্রথমে বর্তমান ছিলেন।

(২) **হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।**
স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈদেবায় হবিষা বিধেম॥
ঋগ্বেদ, ১০।১২১।১

অর্থাৎ আদিতে কেবল প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। আবির্ভূত হইবামাত্রই তিনি সর্বভূতের অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী এবং মহাশূণ্যকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। সেই অনির্জ্ঞাতস্বরূপ দেবতার উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ করি।

ব্রহ্ম ভিন্ন যেমন অন্য বস্তু নাই, তেমন তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নাই। তাঁহাতেই সকলই গ্রথিত।

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭।৭

অর্থাৎ হে অর্জুন! আমার অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই। মণির মালাতে যেমন মণিগুলি সূত্রদ্বারা গ্রথিত থাকে, তেমনই আমাতেও এই বিশ্বজগৎ গ্রথিত রহিয়াছে।

এইপ্রকার যিনি ব্রহ্ম ও পুরুষোত্তম, যিনি জীব ও জগৎ হইয়াছেন, তাহাকে প্রাণিগণ মোহবশতঃ জানিতে পারে না, সেই মোহিনীশক্তিই তাঁহার মায়া।

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩

প্রাণিগণের যে সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব রহিয়াছে, সে সকলই আমা হইতে জন্মে। আমি কিন্তু সে সবের অধীন নই, যদিও সেগুলি আমার অধীন। জগৎ এই তিনপ্রকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া

আছে। অতএব ঐ তিনগুণের অতীত এবং জন্মমৃত্যু ইত্যাদি পরিবর্তন বিহীন আমাকে জগৎ জানিতে পারে না।

সেই পুরুষোত্তমের মায়ায় জগৎ ত্রিগুণময় ভাবদ্বারা অভিভূত হইয়া আছে বলিয়া তাঁহাকে কেহ জানে না।

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্॥ ১৫।১৫

অর্থাৎ আমি ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত সকলের মনের মধ্যে অন্তর্যামি হইয়া আছি। আমা হইতেই পুণ্যবানদের স্মৃতি ও জ্ঞান হয়, আবার আমিই পাপীদের স্মৃতি ও জ্ঞান লোপ করি। সমগ্র বেদ পড়িয়া যাহা জানিবার আছে তাহা আমিই। আমিই বেদান্তের কর্তা (সম্প্রদায়ের গুরু)। বেদের অর্থ আমিই প্রকৃতরূপে বুঝি। উপরিউক্ত শ্লোক চতুষ্টয়ে শ্রীভগবানের বিশিষ্ট উপাধিকৃত বিভূতি সংক্ষেপে ব্যক্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তমের মায়ায় জগৎ ত্রিগুণময় ভাবদ্বারা অভিভূত হইয়া আছে বলিয়া তাঁহাকে জানে না।

ঈশ্বরই সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত আছেন এবং কুম্ভকার যেমন চক্রের উপর ঘট বসাইয়া ঘুরায়, সেই পরমপুরুষ তেমনি নিজ মায়ার বলে প্রাণীদিগকে ঘুরাইতেছেন। এই মায়া হইতে মুক্ত হইলেই তাঁহাকে জানা যায় বা উপলব্ধি করা যায়।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৮।৬১

হে অর্জুন! মায়ার পুতুল যেরূপ মায়াদ্বারা চালিত হয়, তেমনই ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া, আপন আপন কর্মের বশে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেছেন (সুতরাং মানুষের নিজ ইচ্ছামত কিছুই করিবার নাই)।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ ৭।১৪

আমার এই মায়া অলৌকিক এবং ত্রিগুণময়, সুতরাং এই মায়াজাল মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু যাঁহারা আমার আশ্রয় লন, তাঁহারাই মাত্র এই মায়া ছিন্ন করিয়া মুক্ত হইতে পারে অর্থাৎ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য ধিষ্ঠিতম্॥ ১৩।১৮

সেই ব্রহ্ম সূর্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কেও প্রকাশিত করেন, তিনি অন্ধকারের অর্থাৎ অজ্ঞানের অতীত। তিনি জ্ঞান, আবার তিনিই জ্ঞেয়। জ্ঞানযোগে তাঁহাকে পাওয়া যায়। তিনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান।

প্রাণীমাত্রেই ঈশ্বর স্ব-সত্তায় বিদ্যমান। ভূত মাত্রই ব্রহ্ম, কিন্তু মায়ার দ্বারা মোহিত জীবের সেই অনুভূতির অভাব। যখন এই মায়া অন্তর্হিত হয় তখনই জীব ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হয় অথবা মোক্ষ পায়। বস্তুতঃ জীব ঈশ্বরের সহিত স্বধর্মযুক্ত।

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ॥ ৮।৩

পরমপুরুষ ভগবান বলিলেন—অক্ষরকে—যাহার নাশ নাই, অর্থাৎ সেই পরমাত্মাকেই ব্রহ্ম বলে ; সেই ব্রহ্মই জীবদেহে থাকিলে তাঁহাকে (জীবাত্মাকে) অধ্যাত্ম বলা হয়। যজ্ঞ প্রভৃতি যে সব কাজের ফলে প্রাণীদের জন্ম ও বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম কর্ম। অর্থাৎ এই বীজভূত যজ্ঞ হইতেই বৃষ্ট্যাদিক্রমে স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতনিচয় উৎপন্ন হয়।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১৪।২

এই জ্ঞান লাভ করিলে জ্ঞানী আমারই স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এবং তখন সৃষ্টিকালেও তাঁহার জন্ম হয় না, আবার প্রলয়কালেও লীন হন না (তাঁহার মুক্তি হইয়া যায়)।

জীবের পরিক্রমণ বা জন্ম মৃত্যু

ব্রহ্মের অংশ জীবলোকে জীবভূত হইয়া আছে। জীবভূত হওয়া অর্থে জীবভাবের সহিত প্রকৃতি-ভাবের যুক্ত অবস্থা পাওয়া। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ১৪।৫

অর্থাৎ হে মহাবীর! সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ—এই তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে জন্মিয়াছে। এইগুলি নিত্য আত্মাকে দেহে (আপাত দৃষ্টিতে) বদ্ধ করিয়া রাখে অর্থাৎ করিয়া রাখে বলিয়া ভুলবশতঃ মনে করা হয়।

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ৭।১৩

জগৎ এই তিনপ্রকার ভাবে মুগ্ধ হইয়া আছে। তাই ঐ তিন গুণের অতীত এবং জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি পরিবর্তণ বিহীন আমাকে জগৎ জানিতে পারে না।

জীবভাবে আত্মা একাকী থাকিতে পারে না, উহা পাঁচ ইন্দ্রিয় এবং মনের সহিত জীবস্থ হয়।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ১৫।৭
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥ ১৫।৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ১৫।৯

উৎক্রামন্তং স্থিতংবাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১৫।১০

এই পৃথিবীতে চিরকাল অবস্থিত জীব (জীবাত্মা) আমারই অংশ। যখন প্রলয় হয়, তখন (অবিবেকীর) জীবাত্মা মন এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে লইয়া ভোগের শরীর তৈয়ারী করিয়া আবার সংসারে আসিয়া ভোগ করে। ফুলের গন্ধ লইয়া বায়ু যেরূপ সেই ফুলকে ছাড়িয়া অন্য ফুলে যায়, সেইরূপ জীবাত্মা এক দেহকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয় এবং মনকে লইয়া পুনরায় অন্য দেহকে আশ্রয় করে। এই জীবাত্মা পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক) এবং মনকে আশ্রয় করিয়া বিষয়ভোগে লিপ্ত হয়। জীবাত্মা যখন এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীরে প্রবেশ করে, বা সেই দেহেই অবস্থান করে বা বিষয়ভোগ করে অথবা স্বত্ত্ব ইত্যাদি তিনগুণের দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে (এইরূপ মনে হয়), তখন জ্ঞানিগণ শাস্ত্রজ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা সেই আত্মাকে অবগত হইতে পারেন, কেবল মূর্খেরা তাহা বুঝে না।

ইন্দ্রিয় মনযুক্ত আত্মা পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে। মৃত্যুর পর যে যে লোকেই যাউক না কেন, পুনরায় তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, একমাত্র ব্রহ্মভূত হইলেই আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। গীতায় বলা হইয়াছে—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৮।১৬

অর্থাৎ হে অর্জুন ; ব্রহ্মলোক হইতে এই পৃথিবী পর্যন্ত (সপ্তলোকই অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, সহ, জন, তপঃ এবং সত্যলোক) সকল স্থানের

লোকেরাই পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু আমাকে যিনি লাভ করেন, তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

মায়াদ্বারা মুগ্ধ আত্মা প্রকৃতিস্থ বা দেহস্থ সত্ত্বরজস্তমো গুণের তারতম্য অনুসারে জ্ঞানীদিগের লোক, মনুষ্য লোক বা পশুদিগের লোকপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ ঐ ঐ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এ সম্পর্কে গীতায় বলা হইয়াছে—

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৪।১৫
কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৪।১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৪।১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৪।১৮

অর্থাৎ রজোগুণ প্রবল হইলে যদি মনুষ্যের মৃত্যু হয়, তবে তিনি যে সব লোকের কর্মের প্রতি অত্যধিক আসক্তি থাকে, তাহাদের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তমোগুণ প্রবল হইলে যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তিনি মোহগ্রস্থ (জ্ঞানহীন) পশুপক্ষীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। সৎকর্মের সাত্ত্বিক ফল নির্মল সুখ, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ এবং তামসিক কর্মের ফল মূঢ়তা অর্থাৎ পশু প্রভৃতি জন্মে দৃশ্যমান অজ্ঞান। সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ, আর তমোগুণ হইতে অসাবধানতা মোহ এবং অজ্ঞানতা উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণ যাঁহার মধ্যে প্রধান, তিনি উর্দ্ধলোকে অর্থাৎ দেবলোকে গমন করেন,

যাঁহার রজোগুণ প্রবল, তিনি মধ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্যলোকে থাকেন এবং যাঁহার তমোগুণ প্রবল সে জঘন্য প্রকৃতির বশে নীচলোকে অর্থাৎ নরকে (পশ্বাদি জন্মে) গমন করে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ২।২৭

এইভাবে জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্ম ধ্রুব।

কারণ, যে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার মৃত্যু হইবেই ; আবার, যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার পুনর্জন্ম ঘটিবেই। ইহা কোনভাবেই এড়ানো সম্ভব নহে, ইহা হইবেই হইবে। সুতরাং এই অপরিহার্য বিষয়ে তোমার শোক করা উচিত নহে।

ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত পুনর্জন্ম রোধ করা সম্ভব নহে। গীতায় উক্ত হইয়াছে—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে। ৯।২১

অর্থাৎ তাঁহারা সেই স্বর্গসুখ দীর্ঘকাল ভোগ করিয়া পুণ্যের ফল শেষ হইয়া গেলে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। এইভাবে বেদে যে কর্মরূপ ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, সেই পথে গমন করিয়া ভোগকামী ব্যক্তিগণ কেবলই ইহলোকে যাতায়াত করেন। (মুণ্ডক উপ ১।২।১০ দ্রঃ)।

ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী॥ ১৫।৪

অতঃপর যে স্থানে গমন করিলে তাঁহাদের পুনরায় ফিরিয়া আসিতে না হয়, সেই পরমপদ অন্বেষণ করেন। যাঁহা হইতে এই অনাদি সংসার প্রবাহ নিঃসৃত হইয়াছে, আমি সেই আদি অর্থাৎ পরমপুরুষ বা ব্রহ্মপুরুষের শরণ লইতেছি (শরণাগতিই পরমপদের অন্বেষণ)।

যাহারা ইহলোকে সাধনপথে অগ্রসর হইয়া দুর্বলতাবশতঃ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না তাহারা পুণ্যলোকে বাস করিয়া পরে মর্ত্তলোকে পুণ্যাত্মাদিগের বা যোগীদিগের কুলে জন্মগ্রহণ করে এবং সেস্থানে পূর্বদেহের বুদ্ধি ও সংস্কার লাভ করিয়া সিদ্ধির জন্য প্রযত্ন করে। এই প্রকারে বহু জন্মের পর সে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অথবা মোক্ষলাভ করে। এ সম্পর্কে গীতায় বলা হইয়াছে—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৬।৪১
অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৬।৪২
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন॥ ৬।৪৩
পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে॥ ৬।৪৪

অর্থাৎ সেই যোগী যোগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও, (পুণ্যকর্ম করিয়াছেন বলিয়া) পুণ্যবান ব্যক্তি যে লোকে যান, সেই লোকে

বহুদিন বাস করিয়া, পরে পুনরায় কোন সদাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অর্থাৎ জ্ঞানলাভের ব্যাপারে একাগ্র না হইতে পারিলে জ্ঞানলাভ বাধাপ্রাপ্ত হইলেও, যে মনোভাব লইয়া কার্য করা হইয়াছিল, তাহা সঠিকভাবে কর্মের পথে অন্তরায় তো নয়ই, বরং দ্যোতক। সুতরাং জ্ঞানলাভ না ঘটিলেও কর্মফল প্রাপ্তি ঠিকই হইবে। অথবা কোন জ্ঞানী যোগীর গৃহে বা বংশে তিনি (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপে যোগীর গৃহে জন্মগ্রহণ করাও খুবই দুর্লভ। (পূর্বশ্লোকে যোগভ্রষ্ট স্বল্পাল যোগ অভ্যাসকারীর কথা বলা হইয়াছে এবং পরবর্তী শ্লোকটিতে যোগভ্রষ্ট চিরাভ্যস্ত যোগীর কথা বলা হইয়াছে। উভয়বিধ শ্লোকের জন্ম-সম্পর্ক শেষোক্তটিই দুর্লভতর)। এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি পূর্বজন্মের সাধনায় যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা লাভ করেন এবং তাহার পরে সিদ্ধিলাভ করিবার নিমিত্ত পূর্বাপেক্ষা অধিক যত্ন করিতে পারেন (পূর্বজন্মে) যেস্থানে যোগভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে পুনরায় সাধনা আরম্ভ করেন। এই পূর্বাভ্যাস তাঁহাকে জ্ঞানলাভে এবং একাগ্রচিত্ত হওয়ার ব্যাপারে কিরূপ সাহায্য করিতে পারে, পরবর্তী শ্লোকে সেই কথাই বলা হইয়াছে। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি মুক্তির নিমিত্ত স্বয়ং যত্ন না করিলেও, পূর্বজন্মের সংস্কার বলে যোগের প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি যদি যোগ কি কেবলমাত্র ইহাই জানিবার জন্য যোগে প্রবিষ্ট হন, তাহা হইলেও তাঁহার কর্ম করিবার কোন প্রয়োজন হয় না, তিনি জ্ঞানের পথে উন্নীত হইতে পারেন অর্থাৎ যোগের স্বরূপ জানিয়া যিনি তন্নিষ্ঠ হইয়া যোগাভ্যাস করেন, তাঁহার সাফল্য সম্পর্কে কোনরূপ সংশয় থাকিতে পারে না।

উপাসনা-পদ্ধতি

সেই আদি বা পরমপুরুষকে অবশ্যই ভজনা করা প্রত্যেকের কর্তব্য। কিভাবে সেই ভজনার পথে অগ্রসর হইতে হইবে—এই প্রশ্নের সহজ মীমাংসা সেই পরমপুরুষই দিয়া গিয়াছেন, যদ্দ্বারা মানবমনের সকল সংশয় দূরীভূত হয়। তাঁহার নির্দেশ,—লক্ষ্য স্থির রাখ, একাগ্র মনে তাহার শরণ লও—যেভাবে ইচ্ছা তাঁহার পূজার্চনা কর, অবশ্যই তাঁহার নিকট তাহা পৌঁছাইবেই।

গীতার দশম অধ্যায়ে অর্জুন সেই পরমপুরুষকে প্রশ্ন করিতেছেন—

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ ময়া॥ ১০।১৭

অর্থাৎ হে ভগবান্ (পরমপুরুষ)! আমি সর্বদা কিভাবে তোমাকে চিন্তা করিলে তোমাকে জানিতে পারিব? কোন্ কোন্ বিষয়ে ধ্যান করিলে তাহাতে তোমার অধিক প্রকাশ উপলব্ধি করিব তাহা বল, তাহা হইলে সেই সেই পদার্থের মধ্যে তোমাকে চিন্তা করিতে পারি।

তদুত্তরে সেই পরমপুরুষ যাবতীয় বস্তু, প্রাণী, দেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষীর মধ্যে এক একটির নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সেই সেই রূপে তাঁহাকে চিন্তা করা যাইতে পারে এবং দশম অধ্যায়ের শেষে বলিলেন—

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥ ১০।৪২

অর্থাৎ তোমার নিকট কি আর বলিব, কতবস্তুর নাম করিব আর জানিবারই বা তোমার প্রয়োজন কি, কেবলমাত্র ইহাই জানিয়া রাখ

যে, আমার বিভূতির তুলনা নাই, আমিই এক পাদমাত্র দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যপ্ত করিয়া রহিয়াছি। একপাদ অর্থে 'পাদোঽস্য সর্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' (ছান্দোগ্য উপ ৩।১২।৬) অর্থাৎ তাঁহার (ব্রহ্মের) একপাদ সর্বভূত এবং অবশিষ্ট তিনপাদ স্বর্গে বিরাজিত। ইহার অর্থ হইল সেই পরমপুরুষ সর্বজীবে, জড়ে, দেবতায়, যক্ষে, রাক্ষসে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন এবং একাংশদ্বারা জগৎ ধারণ করিয়া আছেন।

যাঁহারা যজ্ঞ করেন, স্বর্গ এবং পুণ্যলোকাদি কামনা করেন, তাঁহারা অবশ্যই তাহা লাভ করেন এবং কিছুকাল সেই সুখ ভোগ করিবার পর পুনরায় তাহাদিগকে এই মনুষ্যলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু যাঁহারা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্॥ ৯।২৩
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ৯।২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্॥ ৯।২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ ৯।২৬
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ৯।২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ৯।২৮

অর্থাৎ যাঁহারা অন্য কামনা পরিত্যাগপূর্বক একান্তভাবে আমারই কথা ভাবেন, চিন্তা করেন আর সকলসময় আমারই উপাসনা করেন, ধ্যান করেন, সেই ভক্তদের আমি ইহলোকে কল্যাণ এবং পরলোকে মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া থাকি। যে সকল ভক্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে অন্য দেবতার উপাসনা করেন, তাঁহারাও না জানিয়া আমারই পূজা করেন। লোকে যতপ্রকার যজ্ঞ করে (সেই সব যজ্ঞ আমার উদ্দেশে না করিলেও) আমি তাহা ভোগ করি (অর্থাৎ ভগবানই যে অন্যান্য দেবতার মূর্তিধারণ করিয়াছেন, তাহা অপর দেবতার উপাসকগণ জানেন না। এই নিমিত্ত অন্যান্য দেবতার উপাসনাও অজ্ঞানপূর্বক সেই পরমপুরুষেরই উপাসনা। (গীঃ ৬।২০-২২, ৯।২৪-২৫ দ্রঃ।) এবং তাহার ফলদান করি। আমার সম্বন্ধে এই কথা তাঁহারা উত্তমরূপে অবগত নহেন। তাই তাঁহারা পরম কল্যাণের পথ হইতে দূরে চলিয়া যান অর্থাৎ তাঁহাদিগের মুক্তিলাভ হয় না।

দেবতার-পূজা বা অর্চনা করিলে ভক্তগণ দেবলোকে গমন করেন। পিতৃগণের পূজা করিলে তাঁহারা পিতৃলোকে গমণ করেন। ভূতপূজা করিলে তাঁহারা ভূতলোকে গমন করেন। কিন্তু ভক্তগণ আমার আরাধনা করিলে ভক্তগণ আমাকেই লাভ করেন। যিনি আমার প্রতি ভক্তি করিয়া, শুদ্ধমনে আমাকে পত্রপুষ্প ফল জল প্রভৃতি দান করেন, আমি সেই ভক্তের দান সাদরে গ্রহণ করি। হে অর্জুন! তুমি যাহা কর, যাহা গ্রহণ কর, যে যজ্ঞ বা যে দান কর, অথবা যে তপস্যা কর, সে সবই আমাকে দান কর, অর্থাৎ আমাকে লক্ষ্য করিয়া কর। সে কারণেই কর্মের শুভ বা অশুভ যে ফল (যাহাতে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে) তাহা হইতে মুক্তি পাইবে। তুমি এইভাবে কর্ম ত্যাগ করিতে পারিবে এবং (জীবিতকালেই) সংসারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমাকেই লাভ

করিতে পারিবে। অর্থাৎ পুনরায় আর দেহ ধারণ করিতে হইবে না।

আত্মভাব অর্থে গীতায় উক্ত হইয়াছে—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ৭।১৭
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্॥ ৭।১৮

এই চারিপ্রকার পুণ্যাত্মা লোকের মধ্যে জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীকে আমি ভালবাসি, জ্ঞানীও আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। এই চারিপ্রকার পুণ্যাত্মা সকলেই ভাল, তবে জ্ঞানী আমারই আত্মা (আমা হইতে পৃথক নহেন)। কারণ, তিনি একমন হইয়া আমিই একমাত্র গতি মনে করিয়া আমারই শরণ লন।

অন্যান্য দেবতার উপাসনাও যে অজ্ঞানপূর্বক ভগবানেরই উপাসনা সে সম্পর্কে গীতা বলিয়াছেন—

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥ ৬।২০
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥ ৬।২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ৬।২২

অর্থাৎ যে অবস্থায় যোগস্থ হইলে মন বিক্ষিপ্ত না হইয়া শান্ত সমাহিত ভাবে অবস্থান করে এবং যে সময়ে পরব্রহ্মকে আপনার মধ্যে অবলোকন করিয়া আপনাতেই সন্তুষ্ট থাকা যায় (তাহাকেই যোগ বলা হয়)। যে সময় বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের যোগ না হইয়াই অত্যন্ত সুখ জন্মে, এবং জ্ঞানী

ব্যক্তি যে অবস্থায় থাকিলে আপন স্বরূপ হইতে কিছুতেই বিচলিত হন না (সেই অবস্থাই যোগ)। যে অবস্থা লাভ করিলে তিনি অন্য কোন লাভকেই তদপেক্ষা বেশী বলিয়া ভাবেন না, যে অবস্থায় থাকিলে তিনি গুরুতর কষ্টেও একটুও বিচলিত হন না (তাহাই যোগ)।

ভগবানই সর্বময় এই জ্ঞান দুর্লভ। বহু জন্মের পর কাহারও কাহারও এই জ্ঞান দেখা দেয়—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ ৭।১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া॥ ৭।২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ ৭।২১
স তয়া শ্রদ্ধয়াযুক্তস্তস্যা রাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ ৭।২২

অর্থাৎ বহু জন্মের পর জ্ঞানীর জ্ঞান ক্রমে বর্দ্ধিত হইলে তখন তাঁহার উপলব্ধি হয় বাসুদেবই (পরমপুরুষ অর্থে আমিই) সব। তখন তিনি আমাকেই লাভ করেন। এইরূপ মহাত্মা কিন্তু সহজলভ্য নহে (অত্যন্ত দুর্লভ)। নানারূপ কামনার উদ্ভব হইয়া যাঁহাদের জ্ঞান নষ্ট করিয়া দেয়, তাঁহারা আপন আপন কৃতি অনুযায়ী নানাপ্রকার নিয়ম পালন করিয়া নানা দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। যে যে ভক্ত ভক্তি করিয়া যে দেবতার পূজা করেন, আমি সেই সেই দেবতাতেই তাহাকে অচলা ভক্তি দিয়া দিই। সেই ভক্তি লইয়া সে সেই দেবতার পূজা করে, আর

সেই দেবতাই তাহার সকল কামনা পূর্ণ করেন। কৃতপক্ষে অবশ্য আমিই সেই সকল কামনা পূর্ণ করিয়া থাকি।

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি॥ ৭।২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥ ৭।২৪

সেই সকল দেবতার যাহারা পূজা করে, তাহাদের বুদ্ধি অল্প—কারণ তাহারা দেবতার পূজা করিয়া যে ফল লাভ করে, তাহা ক্ষণস্থায়ী। দেবতার ভক্তেরা দেবতার পূজা করিয়া (নশ্বর) দেবলোকে গমন করেন এবং আমার ভক্তেরা আমার সেবা করিয়া আমাকেই লাভ করেন (তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না)। আমি যে নিত্য, সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, এই পরমসত্য উপলব্ধি না করিয়া স্বল্পশুদ্ধি ব্যক্তিরা আমার উপর ব্যক্তিভাব আরোপ করে (অর্থাৎ তাহাদের বোধ জন্মে যে আমি মনুষ্য, মৎস্য, কূর্ম ভৃতিরূপে জন্মগ্রহণ করি। কৃতপক্ষে কিন্তু আমি কখনও কোনরূপে জন্মগ্রহণ করি না)।

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥ ৭।২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন॥ ৭।২৬

আমি যোগমায়াদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া থাকি, সুতরাং (দুই-একজন ভক্ত ব্যতীত) কেহই আমার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। আমার জন্ম নাই, আমি নিত্য, আমার সম্পর্কে এই সত্য মূর্খেরা উপলব্ধি করিতে পারে না (এবং সেই কারণেই তাহারা আমার সেবা করে না)। হে

অর্জুন! আমি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সকল প্রাণীকেই জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ॥ ৭।২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মাণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥ ৭।২৮

হে মহাবীর অর্জুন! জন্মের সময়ে সকল প্রাণীই মোহে একবার অভিভূত হইয়া পড়ে। ইচ্ছা এবং দ্বেষ হইতে সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যে বিরুদ্ধ ভাব জন্মে, তাহাতেই এই মোহের সৃষ্টি হয়। যে সকল পুণ্যবান লোকের পাপক্ষয় হইয়াছে, তাঁহারাই ঐ সকল সুখ-দুঃখ হইতে যে মোহ জন্মে, তাহা এড়াইয়া মনের বল লইয়া আমারই সেবা করিয়া থাকেন।

পরমপুরুষের ভজনাকারী মহাপুরুষ যে দুর্লভ সে সম্পর্কে গীতা বলেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৭।৩

অর্থাৎ সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধিলাভের (মোক্ষলাভের) জন্য চেষ্টা করেন! আর যাঁহারা এইরূপ চেষ্টা করেন, সেইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যে আবার কদাচিৎ একজন আমাকে উত্তমরূপে জানিতে পারেন।

যাহারা সেই পরমপুরুষকে উপলব্ধি করে না, অর্থাৎ আমাকে মায়াবাদীরূপে কল্পনা করেন, তাহাদের সম্পর্কে গীতা বলিতেছেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবম জানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ৯।১১

অর্থাৎ আমি নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব এবং সকলের অন্তরাত্মা হইলেও মনুষ্যদেহ আশ্রয়পূর্বক ব্যবহার করি বলিয়া মূঢ়গণ আমার (আকাশকল্প) পরমাত্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

গীতায় উক্ত হইয়াছে, পরমপুরুষের সহিত কর্মের মধ্য দিয়া যোগযুক্ত হওয়াই উপাসনা বা পূজা, নিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া ভক্তিভাবে নিষ্কাম কর্ম করিয়া যাওয়ার অর্থই হইল পরমপুরুষের সেবা করা, অর্চনা করা; কোন ধর্মের সহিত, কোন পূজা-পদ্ধতির সহিত গীতার কোনরূপ বিরোধ নাই। যাহার যাহাতে ভক্তি, যেরূপ ভক্তি তিনি অর্থাৎ সেই ভক্ত তদনুরূপ ফল লাভ করিবেন। যেস্থানে চিত্ত সেই পরমপুরুষে অর্পিত, সেস্থানে সাত্ত্বিক ভাব; যেস্থানে সৎকর্ম, নিষ্ঠা সেই স্থানেই গীতার মতে পরমপুরুষের পূজা-উপাসনা।

সমাপ্ত

গীতায় সাধনা

অভিমত

গীতার সাধনা সমগ্র মানবজাতির চিরন্তন সাধনা। এ-জন্য স্মরণাতীত কাল হ'তে, সমস্ত পৃথিবীব্যাপী এই শাস্ত্রের বিপুল সমাদৃতি। বস্তুতঃ গীতা জাতি-ধর্ম, বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে পুরুষার্থ-কামী ব্যক্তি মাত্রেরই উজ্জ্বল সাধন-দর্পণ স্বরূপ।

গীতার প্রবক্তা সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। তাই এই শাস্ত্র শ্রীমদ্-ভগবদ্ গীতা নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ কেবল মহাভারতেরই শ্রেষ্ঠ পুরুষ নন। তিনি অখিল বিশ্বমানবের প্রাণপুরুষ। একাধারে তিনি জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, যোগিশ্রেষ্ঠ, ভক্তশ্রেষ্ঠ, কর্মিশ্রেষ্ঠ। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ—পরিপূর্ণ মানব, পরমপুরুষোত্তম।

গীতা পুরাণমুনি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে সংগ্রথিত। কুরু-ক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধে মহাবাহু পার্থকে প্রতিবোধিত করার জন্য পার্থসারথি-কণ্ঠে এই অমৃতবর্ষিণী গীতা সমুদ্গীত হয়। অর্জুনকে উপলক্ষ্য ক'রে গীতার উপদেশগুলি বর্ষিত হ'লেও, যুগযুগান্তর ধরে নিখিল বিশ্ববাসী সেই সুধাপানে সুচরিতার্থ।

গীতার উপদেশ সমূহ অতি পুরাতন হ'লেও চির নূতন এবং সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রতিটি মানবের প্রতিবোধের মহামন্ত্র স্বরূপ। গীতার শিক্ষাদর্শ চেতনাসম্পন্ন মানব মাত্রেরই নিকট পরম উপাদেয়। এই শাস্ত্রের প্রতিটি শ্লোকই মহান্ শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সচেতন। এই জন্য সেগুলির আবেদন ও প্রভাব অপরিসীম, অপ্রতিহত এবং সর্বগত।

গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী—ভারতীয় শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেরই সার। এই জন্য এঁর মহিমা সর্বাতিশায়ী। ভারতীয় বিভিন্ন প্রস্থানের আচার্যগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শাস্ত্রের ভাষ্য-টীকাদি

প্রণয়ন ক'রেছেন। অতএব সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, ভারতীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক মত-বিরোধ ও বাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও এই শাস্ত্র যুগ যুগান্তর ধরে সকল সম্প্রদায়েরই উপজীব্য।

গীতার ছত্রে ছত্রে ভাগবত জীবন লাভের উচ্চ আদর্শ ও সার্থক সাধন-নির্দেশ নিহিত। বেদ-উপনিষদাদিতে যে-সকল দার্শনিক তত্ত্ব প্রপঞ্চিত হ'য়েছে, সে সমুদয়ের পরিপূর্ণ সমন্বয় গীতায় বর্তমান। সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র অধ্যয়নে বঞ্চিত হ'য়েও কেবলমাত্র গীতার সম্যক্ পাঠে মুমুক্ষুর আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারে।

এই শাস্ত্রে পাঞ্চজন্য-কণ্ঠে আত্মার নিত্যতা উদ্‌ঘোষিত।—আত্মা শাশ্বত, পরিণাম শূন্য; এঁর জন্ম-মৃত্যু বা ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই; শরীর বিনষ্ট হ'লেও আত্মা অবিনাশী। গীতায় সাধনা যেরূপ বাস্তব সেইরূপ তত্ত্বপূর্ণ।—কর্মেই মানবের অধিকার, কর্মফলে নয়। যোগস্থ হ'য়ে অর্থাৎ কর্মের সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়ে সমবুদ্ধি ক'রে কর্মানুষ্ঠান করা কর্তব্য।

গীতা আত্মোন্নতির জন্য আত্মনির্ভর হ'তে শিক্ষা দেন।—আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার ক'রতে হবে। কখনই আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত করা উচিত নয়। কারণ আত্মাই আত্মার উদ্ধারকর্তা বন্ধু আবার বন্ধনকর্তা শত্রু। এই শাস্ত্র আবার শরণাগতিও শিক্ষা দেন।—অনন্য-চিত্তে শ্রীভগবানের শরণাগত হ'তে হবে। নিত্য ক্রিয়া-কর্ম, ব্রত-তপস্যা, দান-ধ্যান, আহার-বিহার—সমুদয়েরই ফলাফল তাতে অর্পণ করা কর্তব্য। সর্বতোভাবে তাতে আত্মসমর্পণ ক'রতে হবে।

অষ্টাদশাধ্যায়ী গীতার প্রতিটি অধ্যায়ই এক একটি 'যোগ' নামে অভিহিত। এই জন্য গীতা 'যোগশাস্ত্র' নামে খ্যাত। যা হোক, এঁর তৃতীয় অধ্যায়ে 'কর্মযোগ' চতুর্থ অধ্যায়ে 'জ্ঞানযোগ', নবম অধ্যায়ে

'রাজযোগ' এবং দ্বাদশ অধ্যায়ে 'ভক্তিযোগ'-এর মাহাত্ম্য পরিকীর্তিত। আবহমান কাল হ'তে ভারতে পরমার্থ লাভের উপায় স্বরূপে উক্ত যোগচতুষ্টয় সর্বত্র স্বীকৃত ও সুপ্রচলিত। অধিকারী বিশেষে এই সাধন পন্থা-চতুষ্টয় প্রত্যেকটিই সার্থক ও অপরিহার্য। কারণ প্রতিটি পন্থাই স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। অবশ্য, ঐ যোগচতুষ্টয়ের সম্যক্ সমন্বয়েও মানব জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ সম্ভবপর।

গীতার শ্লোকগুলি অত্যন্ত সুললিত এবং সুখপাঠ্য হলেও ঐগুলির অন্তর্নিহিত মর্ম গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এই জন্য দেশ-বিদেশের নানা মনীষী-পণ্ডিত এই শাস্ত্রের শত শত ভাষ্য ও অজস্র টিকা-টিপ্পনী প্রণয়ন করেছেন ও ক'রছেন।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত প্রীতিকুমার ঘোষ মহাশয়ের 'গীতায় সাধনা' গ্রন্থটি আদ্যোপান্ত পাঠ ক'রে আমি বিশেষ মুগ্ধ হ'য়েছি। তিনি একজন সমর্থ সাধক, যোগী এবং মনীষী। দীর্ঘকাল ধ'রে তিনি একনিষ্ঠভাবে গীতার তত্ত্ব ও মহিমা প্রচারে ব্রতী রয়েছেন। তাঁর 'সরল গীতা' গ্রন্থখানি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সর্বত্র বিশেষ সমাদর লাভ ক'রেছে। আমার বিশ্বাস, তাঁর এই গ্রন্থটিও যথেষ্ট সমাদৃত হবে। কারণ, তাঁর ভাষ্য সাধারণ পণ্ডিতগণের রচনার মত নয়। এই গ্রন্থে ছত্রে ছত্রে সাধকের প্রজ্ঞালোক ও অপরোক্ষানুভূতি বর্তমান। স্বল্প-পরিসরের এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠে অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাগণ অশেষ উপকৃত হবেন। আমি সর্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থটিরও বহুল প্রচার কামনা করি।

"সারদায়ন"
২৬৮, এস. কে. দেব রোড্
কলিকাতা—৪৮
শুভ ১লা বৈশাখ, ১৩৮০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
বেদশাস্ত্রী
(প্রখ্যাত বেতার-কথক ও ধর্মশাস্ত্র প্রবক্তা)

- ২ -

পরমশ্রদ্ধেয় গীতারত্ন—শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার অমৃতবাণী, যা মানব জীবনের সারসত্যতা প্রচারের জন্য গীতা প্রচার কেন্দ্র প্রায় বিশ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং 'সরল গীতা' নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করে তিনি সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছেন। 'গীতায় সাধনা' তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক। তিনি বুঝেছেন কর্ম-বাদ, জ্ঞানবাদ, ভক্তিবাদ প্রভৃতি কোন মতবাদই শাস্ত্রবিরুদ্ধ অলীক কল্পনা নয়। যিনি যে পথের পথিক হবার উপযুক্ত পাথেয়সংগ্রহ করেছেন, শাস্ত্র তাঁকে সেই পথে চলবার নির্দেশ দিয়েছেন। ইহাদের মূলে আছেন কেবল অধিকারভেদ। কর্ম, জ্ঞান, ও ভক্তি যে পরস্পর বিযুক্ত নয়—অধ্যাত্ম সাধন মালার এক সূত্রে গ্রথিত বিভিন্ন ফুল, এই চিরকালীন, মহাসত্য যা পার্থসারথির মুখ থেকে সুদূর অতীতে ধ্বনিত হয়েছিল, আজ 'পার্থ সারথি' সম্পাদক সেই উপদেশাবলী গীতার আঠারোটি অধ্যায় থেকে চয়ন করে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ নামক তিনটি পৃথক অধ্যায়ে গীতোক্ত সাধনের মর্মকথা সহজ সরল ভাষায় এই পুস্তকে ব্যক্ত করেছেন।

কর্ম যেখানে কর্মীকে আনন্দময় আত্মার সন্ধান দিতে পারে, সেখানেই কর্মের সার্থকতা। এই কর্ম কী তা পণ্ডিতেরাও বুঝতে পারেন না। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : In this matter even the sages are perplexed and deluded. কিন্তু লেখক শ্রীপ্রীতিকুমার কামনার দাস না হয়ে ব্রহ্মার্পন বুদ্ধিতে কর্ম-অনুষ্ঠিত হলে কর্ম বন্ধন না হয়ে মুক্তিরই সহায়ক হয় এবং গীতার কোথাও তাই কর্মত্যাগের উপদেশ দেওয়া হয়নি, "নিষ্কাম কর্মযোগই গীতার শ্রেষ্ঠ বাণী"—এই কথা এমন সুন্দর-

ভাবে বিবৃত করেছেন, যা পড়লে আমাদের মত সাধারণ মানুষও গীতার তত্ত্ব কিছুটা বুঝতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন : কর্মযোগ means the offering of all works to the Lord when the personality of the instrumental doer ceases, though he acts, he does nothing, for he has given up not only the fruits of his works but the works themselves and the doing of them to the Lord.

ইহলোকে জ্ঞানের মতোন পবিত্র আর কিছু নেই, এই জ্ঞান কিন্তু সহসা মেলে না, ইহা সব সময়েই সাধন সাপেক্ষ। কর্মযোগী কাল সহকারে সাধনায় সিদ্ধ হলে, আপনার অন্তরে ইহা আপনি লাভ করেন। এই আত্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ও স্বপ্রকাশ। এই মহাসত্য লেখক গীতার বিভিন্ন অধ্যায় থেকে ভগবানের বাণীগুলি সঞ্চয়ন করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে শ্রদ্ধা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও আত্মসংযম এই তিনটি হচ্ছে জ্ঞান-লাভের অন্তরঙ্গ সাধন আর শ্রদ্ধাহীন অবিশ্বাসীর 'ইহলোক-পরলোক' বলে কিছুই নেই। কর্ম ঈশ্বরে অর্পণ করলেই কর্মফল ত্যাগ করা হয়। নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যাঁর কর্ম ঈশ্বরে সমর্পিত হয়েছে, জ্ঞানের দ্বারা যাঁর সকল সংশয় ছিন্ন হয়েছে, এই রকম আত্মবিৎ পুরুষকে কর্ম সকল কখনই আবদ্ধ করতে পারে না। তাই তাঁর আর বন্ধনের কোন আশঙ্কা নেই।

শ্রীঅরবিন্দের কথায় : The second is জ্ঞানযোগ the self-realisation and knowledge of the true nature of the Self and the world and here the insistence is on knowledge, but the sacrifice of works continues and the path of works becomes one with but does not disappear into the path of knowledge.

মহাত্মা গান্ধী বলেছেন যে, গীতার ভক্তিভাবে ভুলে থাকা নয় বা অন্ধ শ্রদ্ধা নয়। মালা গলায় দেওয়া বা তিলক কাটাও ভক্তির লক্ষণ নয়। যে দ্বেষ করে না, যে নিরহঙ্কার, যার কাজে সুখ, দুঃখ, শীত, গ্রীষ্ম সমান, যিনি ক্ষমাশীল, যিনি সব সময়েই সন্তুষ্ট, যার সঙ্কল্প টলে না, যিনি মন ও বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করেছেন, যিনি শুভ অশুভ ত্যাগ করেছেন, যিনি পবিত্র, যিনি শত্রুমিত্রের প্রতি সমভাবাপন্ন, যিনি নিরপেক্ষ, যার কাছে মান-অপমান সব সমান, যিনি স্তুতিতে পুলকিত ও নিন্দায় গ্লানিবোধ করেন না, যিনি নির্জনতাপ্রিয়, যিনি মৌণধারী, যিনি স্থিরবুদ্ধি, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ভক্ত।

হে করুণাময়, আমি ধর্ম জানি না, আমি কর্ম জানি না, তপস্যা জানি না। আমি একমাত্র তোমাকেই জানি। তুমিই আমার ধর্ম-কর্ম, তুমিই আমার যজ্ঞ-তপস্যা, ধ্যান-ধারণা। তুমিই আমার সাধনা, তুমিই আমার সিদ্ধি—ইহাই হচ্ছে ভক্তির পরম পরাকাষ্ঠা। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়, the ভক্তি which regards, adores and loves Me alone in all things.

শ্রদ্ধেয় প্রীতিবাবু 'গীতায় সাধনা' গ্রন্থে জ্ঞান ও ভক্তি ছাড়া যে আমাদের জীবন বঞ্চিত জীবন, সেই অমৃতবাণী যা ভগবানের মুখের বাণী গীতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের সার্থক জীবন যাপন করতে আহ্বান জানিয়েছেন বলে তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মানবজীবনের চরম তত্ত্ব গানের ছলে ভগবান আমাদের কাছে ঢেলে দিয়েছেন, "গীতার এমন গান—যাহাতে জুড়ায় প্রাণ", সেই চিরন্তণী কথা অন্তরতমের বাণী, জীবনের সার সত্য, লেখক আপন জনের বিশ্বব্যাপী কো'ল কেমন করে ধরা যায় গীতার সেই সুসংবাদ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ায়

অধ্যাত্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসু পাঠকগণ যে গভীর তৃপ্তিলাভ করবেন এই কথা নিঃসংশয়ে আজ বলতে পারি। তিনি সুস্থদেহে শান্তিময় ভাগবতজীবন লাভ করুণ এবং গীতা কথামৃত আমাদের আরও শোনান—ইহাই পার্থসারথির চরণে আমার একান্ত প্রার্থনা—

"ধর্মে উদারতা আর কর্মে নিষ্কামতা,
কে শিখালো জগতেরে ?—ভারতের গীতা।
বিশ্বধর্ম, বিশ্বপ্রেম, বিশ্বমানবতা
কে শিখালো জগতেরে ?—ভারতের গীতা।
(তাই) দেশে দেশে অনুদিতা, আদৃতা, অধীতা
জগতের ধর্মগ্রন্থ ভারতের গীতা।"—জগদীশ

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র,
বিদ্যাবিনোদ
প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও
জীবনীকার

"মিত্রাণী"
২ কালী লেন, কলিকাতা
২৯ ফাল্গুন ১৩৭৯

- ৩ -

শ্রীমদভগবদ্ গীতা হচ্ছে জীবনের জয়গান। এই মহাগ্রন্থে শ্রীভগবানের অবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ মানব জীবনের চরম ও পরম কথা শুনিয়েছেন ভক্ত ও শিষ্য অর্জুনকে। এ কেবল তিনি অর্জুনকে শোনান নি, তাঁর মাধ্যমে শুনিয়েছেন আমাদেরও। গীতার বিষয়বস্তু চিরদিন অম্লান ও অক্ষয় থাকবে। কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের এমন সরলভাবে ব্যাখ্যা গীতা ছাড়া অন্যান্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে বিরল। গীতার বৈশিষ্ট্য তাই। এ একদিকে যেমন সরল অন্যদিকে তেমনি কঠিন। অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি যেমন এর তত্ত্বকথা নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামান তেমনি অনেক যোগী এবং সাধক এর তত্ত্বকথাকে নিজের যোগশক্তির বলে অত্যন্ত সহজ-সরল ও জীবন্ত করে প্রকাশ করেন ভক্ত ও শিষ্যজনের কাছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সাধক শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ মহাশয় যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমদভগবদ্ গীতার দুরূহ ও গুহ্য তত্ত্ব নিজে সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করে আমাদের নিত্য জীবনের ব্যবহারোপযোগী ব্যাখ্যা করে আমাদের করকমলে অর্পণ করেছেন। তাঁর এই প্রকার প্রচেষ্টা যুগোপযোগী এবং বর্তমান কালের পথভ্রষ্ট ও কেন্দ্রচ্যুত সমাজজীবনের কাছে ধ্রুবতারা সদৃশ। সীমিত অংশের মধ্যে তিনি মহৎ গ্রন্থের যে রূপ সারতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন তা পাঠ করলে যে কোন পাঠকের চিত্ত ভগবৎতত্ত্বে লীন হয়ে যায় এবং উক্ত মহান গ্রন্থের মহিমা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ যোগীজনেরাই যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব-জ্ঞানের মহিমা বুঝতে পারেন এবং তা সহজ সরল করে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্যে প্রচার করতে পারেন : এদিক দিয়ে বিচার করলে শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ মহাশয়ের অবদান ধন্যবাদার্হ।

গীতায় শ্রীভগবান নিজে বলেছেন, যুগের প্রয়োজনে লোককল্যাণের জন্যে তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন। এ মহাসত্য আজও অম্লান আছে। এই কলিকালেও শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণরূপে শ্রীভগবানের আবির্ভাব ঘটেছে। এছাড়াও পরম যোগী, সদগুরু ও সিদ্ধ সাধকের মারফৎ শ্রীভগবান তাঁর মহান কৃপা দুর্গত ও পথহারা জনগণের কানে শোনান। আমাদের কাছের মানুষ পরমবন্ধু সাধক ও নিরভিমানী শ্রীপ্রীতিকুমার ঘোষ মহাশয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অমর গান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গুহ্য কথা আমাদের মত সাধারণ অনুরাগী ও ভক্তদের কানে শোনাবার জন্যে ব্রতী হয়েছেন। আশা করি তাঁর এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে। তাঁর প্রণীত 'সরল গীতা' ইতিমধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। আমার বিশ্বাস, এই গ্রন্থখানিও তদ্রূপ জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হবে। এ ব্যাখ্যা স্বয়ংসম্পূর্ণ। এর জন্যে পৃথকভাবে ভূমিকা লেখা নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। পাঠকগণ এটি পাঠ করলেই বুঝতে পারবেন এর অন্তর্নিহিত অর্থ।

গীতা চির পুরাতন হলেও চির নতুন। এর মাহাত্ম্য কোন যুগে কোন কালে ম্লান হয় না, বরং দিন দিন উজ্জ্বল হতে থাকে এবং যুগোপযোগী সত্য নিয়ে নিজের সুপ্রাচীন ও সনাতন মাহাত্ম্য ব্যক্ত করে চলেছে পরম সিদ্ধ যোগী, সদ্গুরু ও সাধকদের সাধনলব্ধ শক্তি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে।

শাস্ত্র মোক্ষলাভের প্রধান উপায়। গুরুর সাহায্যে সেই শাস্ত্রানুসারে চলতে অভ্যাস করতে হয়।

উল্লিখিত তত্ত্বকথা স্মরণ করে বলা যায় যে সাধক প্রীতিকুমারের গীতার ব্যাখ্যা সর্বসাধারণের কাছে আদৃত হবে। কারণ তিনি উক্ত

গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অধ্যাত্ম তত্ত্বকে সুন্দর ও সরলভাবে পরিবেশন করেছেন। এটি জাতীয় জীবনে এক পরম ও মহার্ঘ সম্পদ। ভাবী ভারতীয় জীবনধারা এর আলোকে উজ্জ্বল ও মহীয়ান হয়ে উঠবে।

—অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ।
সাহিত্যিক ও জীবনীকার